মার্চ ২০১৯ ❑ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৫

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

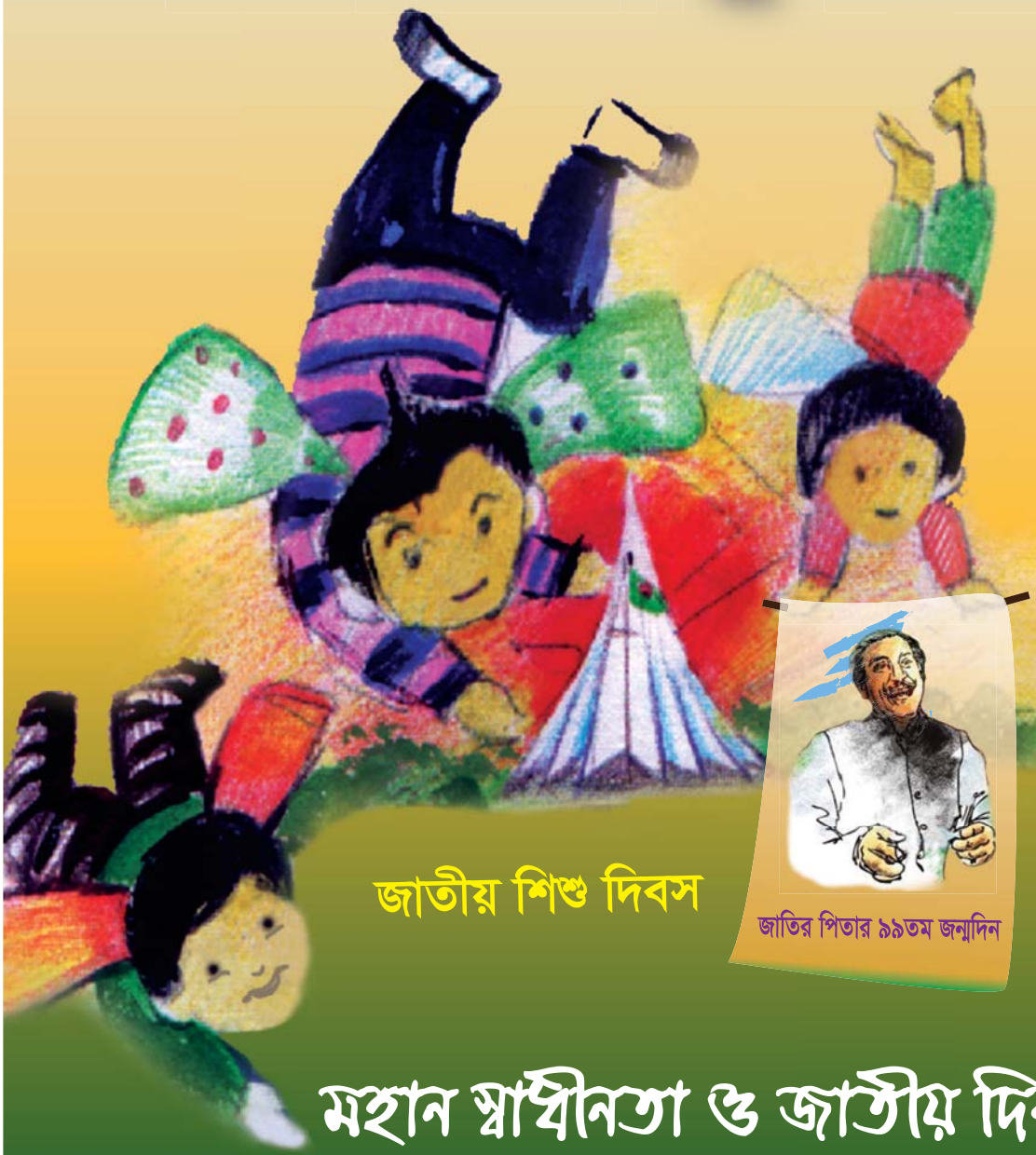

জাতীয় শিশু দিবস

জাতির পিতার ৯৯তম জন্মদিন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

রাইসা সাজনীন খান, পঞ্চম শ্রেণি, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

সিয়ামুল ইলাহি ফারাবি, দশম শ্রেণি, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

সম্পাদকীয়

মার্চ এলেই মনে পড়ে যায়, এই মাসে জন্ম হয়েছিল একটি দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের, এই মাসেই জন্ম নিয়েছিলেন সেই দেশের স্বাধীনতা এনে দেওয়া মহান মানুষটি। বুঝতেই পারছ, আমি কোন দেশের কথা বলছি। তুমি নিশ্চয়ই জানো, আমি কোন মহান মানুষটির কথা বলছি- বাঙালি জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশ নামে আমার, আমাদের এই দেশটার স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তাঁরই হাত ধরে। এই দেশের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মরণপণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, কেবল তিনি বলেছিলেন তাই। তাঁর জাগিয়ে তোলা দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ত্রিশ লাখ বাঙালি নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন, লাখো মানুষ হয়েছিলেন সবহারা।

২০২১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ পালন করবে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীও পালিত হবে ২০২১ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে। এই আনন্দের সুর এখনই জেগে উঠেছে আকাশে-বাতাসে, মানুষের মনে। নবারুণের বন্ধুরাও অসাধারণ সুন্দর লেখা দিয়ে সাজিয়ে তুলেছে প্রিয় পত্রিকাটি। এই সংখ্যাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পড়ে জানাবে কিন্তু, কেমন হলো।

সূচি

নিবন্ধ

০২ বঙ্গবন্ধু উপাধি'র ৫০ বছর/ইভা ফারহানা
০৪ শুভ জন্মদিন নেতা/রহিমা আক্তার মৌ
০৭ দেশে দেশে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালন
মো. জামাল উদ্দিন
১৯ যুদ্ধে শিশুরা কেমন হয়ে যায়/মেজবাউল হক
২০ জাতীয় গণহত্যা দিবস/অরুণিত ভোর
২৫ দেশে দেশে গণহত্যা/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
২৯ স্বাধীনতা দিবস দেশে দেশে/শাহানা আফরোজ
৪০ শিশু-কিশোরদের ভাবনায় স্বাধীনতা/রুমান হাফিজ
৪২ কাউন্টডাউন ২০২১: স্বাধীনতার ৫০ বছর
জান্নাতে রোজী
৪৪ আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল: মুক্তির যোদ্ধা ও
কালজয়ী সুরস্রষ্টা/মোমিন মেহেদী
৫১ ডিমের জাদু/রাজভীর বসাক জুনিয়র
৫২ রহস্যময় স্থাপত্য/খালিদ বিন আনিস
৫৪ বিশেষ শিশুর সাফল্য/জুবাইর জসীম
৫৫ বই আলোচনা/ইমরুল ইউসুফ
৬২ বন্ধুদের জন্য মজার খবর/সাদিয়া ইফফাত আঁখি
৬৩ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ

গল্প

১০ খোকা'র সাহস/আঁখি সিদ্দিকা
১৩ যুদ্ধদিনের কথা/খন্দকার মাহমুদুল হাসান
২৭ কালরাত্রি/ফারজানা তান্নী
৩৫ মিশন করাচি/সিরু বাঙালি
৪৬ এক যে ছিল ময়না/ জোহরা শিউলী
৫৭ An Open Letter To Sleep
Kazi Miftahul Jannat
৫৮ পদ্ম ডিঙ্গি/মিনা মাশরাফী
৬০ টিয়ের বন্ধু কে?/অনুবাদ: নাবীল অনুসূর্য

প্রধান সম্পাদক: মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন **সিনিয়র সম্পাদক:** মোঃ এনামুল কবীর **সম্পাদক:** নাসরীন জাহান লিপি
সহ-সম্পাদক: শাহানা আফরোজ, মো. জামাল উদ্দিন, তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
সম্পাদকীয় সহযোগী: মেজবাউল হক, সাদিয়া ইফফাত আঁখি
সহযোগী শিল্পনির্দেশক: সুবর্ণা শীল **অলংকরণ:** নাহরীন সুলতানা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৮৫, **E-mail :** editornobarun@dfp.gov.bd, **ওয়েবসাইট:** www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ: সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০, **মূল্য:** ২০.০০ টাকা। **মুদ্রণ :** মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

বঙ্গবন্ধু উপাধি'র ৫০ বছর

খেতে বসেছিলেন বঙ্গবন্ধু। হঠাৎ মনে পড়ল বাড়ির গার্ডের কথা। ও কি খেয়েছে? উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে গেলেন গেটে। নিজেই ধরে নিয়ে বসালেন খেতে। এমন ভাবনা যার সেই তো 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি পাওয়ার যোগ্য।

২৩শে ফেব্রুয়ারি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। ৫০ বছর আগে ১৯৬৯ সালের এ দিনে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন সেই সময়ের ডাকসু ভিপি এবং সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি তোফায়েল আহমেদ। সেই থেকে শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে গেলেন সবার প্রিয় 'বঙ্গবন্ধু'।

সংগ্রহ: ইভা ফারহানা

কবিতা

০৩ রহীম শাহ
০৫ মেশকাউল জান্নাত বীথি
০৬ সোহরাব পাশা, মোহাম্মদ আজহারুল হক
০৮ কামাল হোসাইন, শাহাদাৎ শাহেদ ফারুক হাসান
০৯ আবুল হোসেন আজাদ, ফাতেমা জান্নাত শাহ আলম বিল্লাল
১১ কাওছার মজুমদার
১২ এমরান চৌধুরী, নজমুল হক চৌধুরী নিতু চৌধুরী
২৮ তাসিন মোহাম্মদ
৪৭ মুশফিকুর রহমান মিদুল, মো. জাহিন
৪৮ লিয়াকত আলী চৌধুরী, জান্নাতা নিঝুম শিল্পী মো. আনোয়ার হোসেন
৪৯ আজহার মাহমুদ, মোহ্‌সেন আরা তাজ ইসলাম, ম. মীজানুর রহমান
৫০ আবদুল কুদ্দুস ফরিদী, কাজী দিনার সুলতানা বিন্তী, খায়রুল আলম রাজু
৫১ মো. আরিফ হোসেন

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: রাইসা সাজনীন খান, সিয়ামুল ইলাহি ফারাবি
শেষ প্রচ্ছদ: লিলিয়ান ত্রিপুরা
০৬ মাশরুর সাফির
০৮ মির্জা মাহের আসেফ
১৮ সুলতানা ইয়াসমিন ঈশিতা
২৯ তাসনোভা আলম (লিশান)
৩৪ আফিয়া ইবনাত অর্থী,
৪৩ আফিয়া মাহমুদা লামিশা
৪৫ আরশাফিন বারী পাপান
৫৮ তাসনিয়া আফ্‌ফান মুনতাহা (নীলাঞ্জনা)
৬৪ মোঃ রাফিউল ইসলাম, মো. সিনদিদ হোসেন

রহীম শাহ-এর ছড়াগুচ্ছ

খুকুর খেলার ঘরে

খুকু দেখে খেলার ঘরে
সবই আছে থরেথরে
কিন্তু কেমন লাগছে যেন
কী যেন কী নেই।

বর-পুতুলের সঙ্গে
অন্য রকম ঢঙ্গে
কনে আছে দাঁড়িয়ে
হাত দু'খানা বাড়িয়ে।

পাশে একটি পালকি আছে
বিল্লি আছে দুটো
মাটির হাঁড়ি-পাতিল আছে
কলসি আছে ফুটো।

জামা আছে শাড়ি আছে
পেলাসটিকের গাড়ি আছে
এত আছে কিন্তু সাথে
কী যেন কী নেই।

হঠাৎ খুকু লাফিয়ে উঠে
ছুটে গেল ঘরে
একটি জিনিস নিয়ে আসে
আদর করে করে।

অন্ধকারে হঠাৎ যেন
আলোক ছড়ায় রবি
খুকুর খেলার ঘরে এখন
শেখ মুজিবের ছবি।

তোমার ছবি

মাটির মানুষ শেখ মুজিবুর
কোথায় তুমি নেই
তোমার ছবি টাঙানো আছে
দেশ জুড়ে সবখানেই।

পাখির কাছে গাছের কাছে
রুপোলি সব মাছের কাছে
বাংলাদেশের নদীর কাছে
তোমার একটা ছবি আছে।

তারার কাছে চাঁদের কাছে
রোদের আলোর বাঁধের কাছে
বাংলাদেশের কবির কাছে
তোমার একটা ছবি আছে।

সোনালি ধানক্ষেতের ওপর
ঢেউ খেলে যায় যখন
দিগন্তরে মুজিব তোমার
ছবি দেখি তখন।

শুভ জন্মদিন নেতা

রহিমা আক্তার মৌ

ছোট্ট বন্ধুরা আজ তোমাদেরকে একটা অন্যরকম গল্প শুনাব। তবে তা পুরোটা গল্প নয় সত্যিকারের কিছু কথা। যাঁর কথা শুনাব তাঁকে আমি, আমরা সবাই এক নামেই চিনি, তিনি আমাদের সবার প্রিয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

বন্ধুরা, যে কথাগুলো আজ বলব, সে গল্পের কথাগুলো শুনেছি আমার বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মান্নান (মতিন)-এর কাছে। সবাই বাবাকে কমান্ডার মতিন নামে চিনেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাবা দুই নং সেক্টর থেকে অংশ নেন।

আমাদের গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের বানসা গ্রামে। ১৯৬৯ সালে বাবা সেনাবাহিনীতে সিপাহি হিসেবে চাকরিতে প্রবেশ করেন। তখন বাবার তরুণ বয়স। চাকরিতে প্রবেশ করে কিছুদিন রাওয়ালপিন্ডিতেও ছিলেন বাবা। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিপুল বিজয় অর্জন করেন। তবুও তাকে সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়নি।

১৯৭০ সালের শেষ দিক থেকেই বাবা ঢাকা সেনানিবাসে ছিলেন। তখন দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ খুবই খারাপ। পহেলা মার্চ ১৯৭১ সাল হঠাৎ ঘোষণা হলো জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বাতিল। তারপরই বাংলাদেশের মানুষের সামনে উঁচিয়ে ধরা হলো পাকবাহিনীর মিলিটারির বন্দুক। নিরস্ত্র মানুষ, মজুর, শ্রমিক এবং ছাত্র ভাইয়েরা এই ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রমনায় অবস্থিত রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) অনুষ্ঠিত জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সেই ভাষণ ছিল বাঙালিদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান। দেশনেতা ভাষণ শুরু করেন বেলা ২টা ৪৫ মিনিটে আর শেষ হয় ৩টা ৩ মিনিটে।

পাকিস্তানের নতুন সরকার গঠন বিষয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে শেখ মুজিবের আলোচনা বিফলে যাওয়ার পর ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ মধ্যরাত্রে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকা শহরে নির্বিচারে গণহত্যা চালায়।

২৬শে মার্চ ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলেও বাবার যুদ্ধ শুরু হয় ১৭ই মার্চ থেকে। সেনাবাহিনীতে ছিলেন বলে অনেক খবর পেতেন বাবা, রক্তের স্রোত বইয়ে দেওয়ার খবর আসতো চারদিক থেকে। সেদিনই বাবা সেনাবাহিনীর অফিস থেকে নিজের অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। সোজা চলে যান আওয়ামী লীগ-এর দলীয় অফিসে। গিয়ে দেখেন সেখানে মিলাদ হচ্ছে, দোয়া পড়ানো হচ্ছে। দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ! কি জন্যে দোয়া হচ্ছে জানতে চাইলে অন্যরা বলেন-

আজ আমাদের নেতা শেখ মুজিবর রহমানের জন্মদিন, তাই দোয়া মাহফিল হচ্ছে।

বাবা সেদিনই জানতে পারেন ১৭ই মার্চ নেতার জন্মদিন। বাবা বঙ্গবন্ধুর সাথে সরাসরি দেখা করেন, কথা বলেন, জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন-'শুভ জন্মদিন নেতা'।

বাবা আরো বলেন-নেতা, দেশের অবস্থা ভালো না, আমরা কী করব? আপনি হুকুম দিন।

শেখ মুজিবুর রহমান বললেন-আমি যা বলার ৭ই মার্চের ভাষণেই বলে দিয়েছি। সেই ভাবেই কাজ করো।

বাবা তখনই বেরিয়ে পড়েন সেই অফিস থেকে। ১৮ই মার্চ বাবা নোয়াখালী চলে যান। কয়েকজনকে সাথে নিয়ে ১৯শে মার্চ দখল নেন পাশের একটি থানা। সেখান থেকে সংগ্রহ করেন কিছু অস্ত্র। সে অস্ত্র দিয়েই বাবা এলাকার অন্য যুবকদের নিয়ে ট্রেনিং করাতেন।

বাবা যুদ্ধের অনেক ঘটনাই বলেন, একদিনের ঘটনা—'পাকিস্তানি বাহিনীর ছোড়া গুলিতে রক্তাক্ত হয়ে যায় আমাদের সাথের সহযোদ্ধা বিডিয়ার সদস্য ল্যান্স নায়েক ইদ্রীস। চলতে পারে না সে। ঢলে পড়ছে মাটিতে। তাঁকে তুলে ঘাড়ে নিই আমি। রক্তে ভিজতে থাকে ইদ্রীসের শরীর। ওর রক্তে ভেসে যায় আমার পরনের জামাকাপড়। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া সহযোদ্ধাকে নিয়ে চলতে থাকি আমি। নিজের হাঁটুতে গুলিবিদ্ধ তা নজরে আসেনি। অন্য আরেক মুক্তিসেনা খেয়াল করেন আমার পা-ও রক্তে রঞ্জিত। ওরা আমাকে বলে- মতিন ভাই আপনার পায়ে গুলি লেগেছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তখন বুঝতে পারি সত্যিই তো পুরো পা রক্তে ভেজা। সেই ক্ষতচিহ্ন এখনও যায়নি।'

বাবা আমাদের যুদ্ধাহত সেই চিহ্ন দেখান আর রণাঙ্গনের সহযোদ্ধার শহিদ হওয়ার স্মৃতি মনে করেন।

বন্ধুরা বঙ্গবন্ধুর সেই ১৮ মিনিটের ভাষণটি ১২টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। নিউজ উইক ম্যাগাজিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো প্যারিসে অনুষ্ঠিত তাদের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে ৩০শে অক্টোবর ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে 'বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সংস্থাটি 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ ভাষণটি অন্তর্ভুক্ত করেছে। জাতিসংঘের মতো বিশ্ব সংস্থার এ সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রতি বছর ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনটি জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। ■

প্রিয় নেতা

মেশকাউল জান্নাত বীথি

লাল-সবুজের পতাকা পেতে
রয়েছে যাঁর অবদান
তিনি হলেন জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে
যুদ্ধে নামে বাংলার ছাত্র-জনতা
সবাই মিলে অর্জন করে
বাঙালির প্রিয় স্বাধীনতা।

প্রিয় নেতার জন্মদিনে
জানাই শ্রদ্ধা ও সালাম
যাঁর নেতৃত্বের জন্য
বাংলাদেশ পেলাম।

অষ্টম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা।

তুমি আছো পতাকায়

সোহরাব পাশা

তুমি আছো পতাকার ওই
লাল-সবুজে মিশে
শাপলা ফোটা ঝিলের বুকে
দোয়েল পাখির শিসে

জেগে ওঠে সাত কোটি প্রাণ
একাত্তরে জানি
সাতই মার্চে ছড়িয়ে দিলে
বজ্রকণ্ঠ বাণী

ডাক শুনে তাই গেরিলারা
অস্ত্র হাতে লড়ে,
পাক-সেনাদের হার মানিয়ে
দেশটা স্বাধীন করে

তুমি আছো মাঠে মাঠে
নদীর কলতানে
চিরদিনের ইতিহাসে
সব বাঙালির প্রাণে।

বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন সূচনা করেছিল স্বাধীনতার চেতনা। একুশকে তাই স্বাধীনতার জন্যই স্মরণ করতে হয়, স্মরণে রাখতে হয়।

একুশ

মোহাম্মদ আজহারুল হক

এসেছিল বলে একুশ
হয়েছে প্রতিরোধ
অন্যায় অবিচারে
প্রতিবাদ প্রতিশোধ।

এসেছিল বলে একুশ
বাঙালি মনে
জ্বলেছিল তুষ
স্বাধীনতা আগুনে।

এসেছিল বলে একুশ
হয়েছিল অবশেষ
লাল-সবুজের
রূপসি বাংলাদেশ।

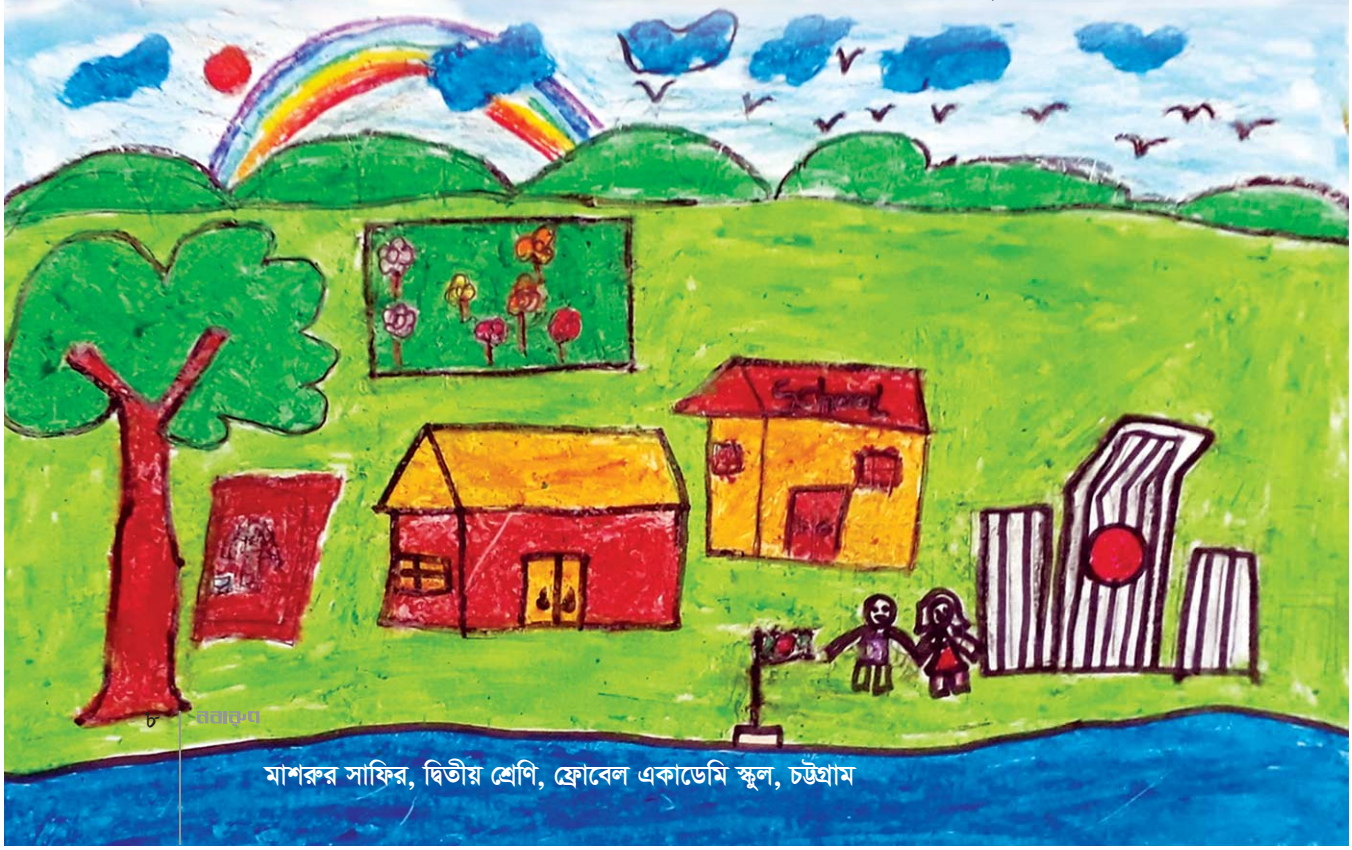

মাশরুর সাফির, দ্বিতীয় শ্রেণি, ফ্রোবেল একাডেমি স্কুল, চট্টগ্রাম

দেশে দেশে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালন

মো. জামাল উদ্দিন

নাইজেরিয়ান শিশু-কিশোদের নিয়ে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস। কেক কেটে শিশুরা আনন্দঘন পরিবেশে বাংলাদেশের স্থপতির জন্মদিন পালন করে।

মেক্সিকো সিটির কলেহিয়ো উইলিয়ামস (দ্বি-ভাষী) স্কুলে প্রায় ২৫০ জন উচ্চ গ্রেডের শিক্ষার্থী নিয়ে উদ্‌যাপন করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস। অনুষ্ঠান শেষে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরে দেশীয় মিষ্টি এবং অন্যান্য খাদ্য উপস্থিত সকলের মাঝে পরিবেশন করা হয়।

শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করে জাপানের টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস। দিবসটি উপলক্ষে দেওয়া রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুর জীবন সংগ্রাম, ত্যাগ ও কর্মজীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে উদ্‌যাপিত হয় বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস। বেকার হোস্টেলে বঙ্গবন্ধুর আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদান, বিশেষ মোনাজাত, জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং বঙ্গবন্ধুর আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দিনব্যাপী পালন।

কবিতার হাট

সেই লোক

কামাল হোসাইন

ইতুদের বাড়িটাতে থাকত সে লোক
কাজে-টাজে অতিশয় নবীন বালক।
ভাত নয়, মাছ নয়– কাটলেট-চপ
খেতো আর মজা পেতো চুষে ললিপপ।

রাত নেই দিন নেই ঝুমঝুমি হাতে–
খেলনা বেলুন পেলে মেতে থাকে তাতে।
গুলতিটা খেলে খেলে হাত পাকাত সে
একটা বাঁশের লাঠি– তেল মাখাত সে।

একদিন এই দেশে এসেছিল দানো
বলল– আপন ভাষা, ভুলে যাও গানও!
প্রতিবাদ করলেই ঠাস-ঠাস গুলি
তবু তাতে দমল না চাষা-তাঁতি-কুলি...

ইতুদের বাড়ি থাকা সেই শিশু-লোক
হঠাৎ মাথায় তার চাপল কী ঝোঁক–
ঝাঁপিয়ে পড়ল সে তো দানোদের প্রতি
তার কাছে টিকল না কোনো মহারথী।

গুলতিতে চোখ-গালে, লাঠিতে পেটায়
গুলবাজ দানোদের সাধটা মেটায়।
সেই লোক ইতিহাসে এক মহাবীর–
একাই একশ সে যে উন্নত শির!

স্বপ্ন ছিল তার

ফারুক হাসান

দু-চোখে তাঁর স্বপ্ন ছিল
বুক ভরা তাঁর মায়া
মায়া মানে সোনার বাংলা
মাটির সাথে কায়া।
দেশ স্বাধীনের জন্যে তিনি
যেই দিয়েছেন ডাক
নামল সবাই বলল হেঁকে
শত্রু নিপাত যাক।
শত্রুর মুখে ছাই ছিটিয়ে
করল স্বাধীন দেশ
মুজিব মানে স্বাধীনতা
মুখর পরিবেশ।

হিমালয়ের মিতা

শাহাদাৎ শাহেদ

একটা গাছ বড়ো হতে হতে
এতটা হয়েছে বড়ো,
দুধ সাদা রং আকাশ এসে
গাছকে ছুঁয়েছে, ধরো।

একটা মানুষ বড়ো হতে হতে
বড়ো হতে পারে কত?
স্মৃতিসৌধ যেন তার পায়ে এসে
হয়ে পড়েছে নত।

একটা মানুষ সৌর্যে-বীর্যে
হিমালয়ের যেন মিতা,
কেউ বলে তাকে বঙ্গবন্ধু
কেউ বলে জাতির পিতা।

মির্জা মাহের আসেফ
তৃতীয় শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

এই ছেলেটিই বঙ্গবন্ধু

আবুল হোসেন আজাদ

গোপালগঞ্জের এই ছেলেটির
গ্রামটি টুঙ্গিপাড়া,
এই ছেলেটি বিশ্বজুড়ে
ফেলেছে কি সাড়া।

এই ছেলেটিই নিপীড়িত
মাতৃভূমির জন্য ,
স্বাধীনতা এনে দিয়ে
হলেন যে অনন্য।

এই ছেলেটি বাংলাদেশ ও
বহির্বিশ্বের মিতা
এই ছেলেটিই বঙ্গবন্ধু
তিনি জাতির পিতা।

তাঁর ডাকে তাই মুক্তিযুদ্ধ
করে স্বাধীন হলাম,
তা না হলে থাকতে হতো
পাকিস্তানের গোলাম।

এই ছেলেটি স্বাধীনতার
ঘোষক একাত্তরে,
শেখ মুজিবুর তাঁর নামে আজ
বুকটা গর্বে ভরে।

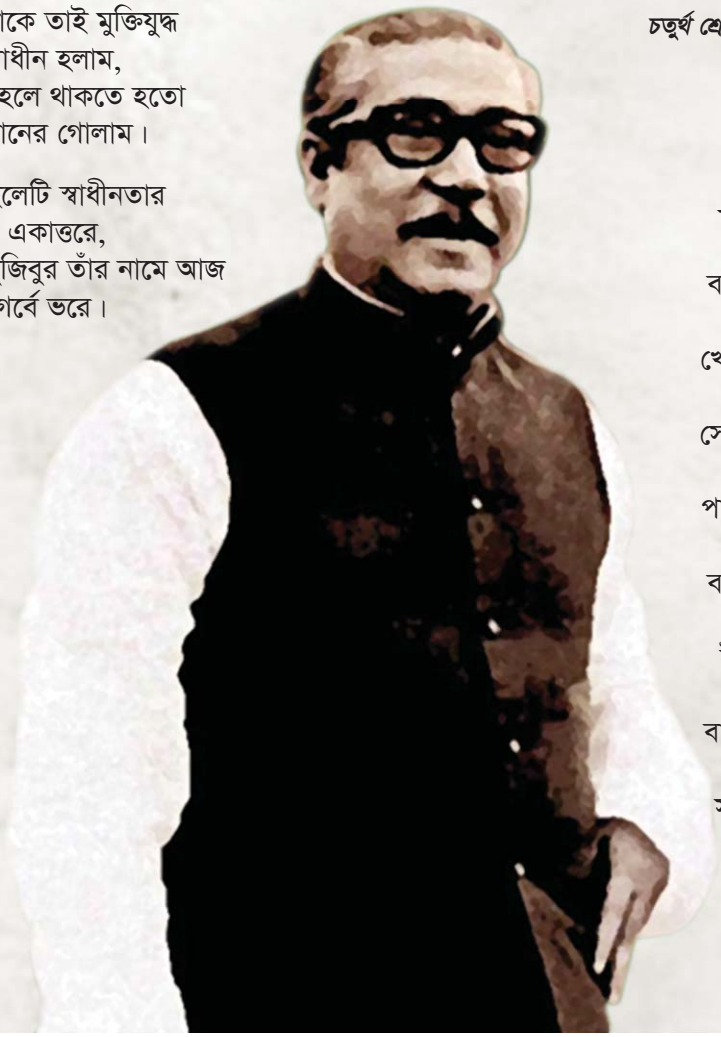

আমার এ দেশ স্বাধীন হলো

ফাতেমা জান্নাত

পাক শাসনের একঘেয়ে ভাব
বুঝতে পারে এ দেশবাসী
সবকিছুতেই ভাগ তাদেরই
বাঙালিরা পায় যে বাসি।

ন্যায্য দাবি করলে পরে
উলটো রেগে করল তাড়া
উঠল ফুঁসে বীর জনতা
বলল তাদের,একটু খাঁড়া!

পাকশাসনের করতে বিদায়
একাত্তরে নামল সবে
আমার এ দেশ স্বাধীন হলো
ভিনদেশিদের তাড়ায় তবে...।

চতুর্থ শ্রেণি, আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট।

বাপের বেটা

শাহ আলম বিল্লাল

বাপের বেটার নাম শুনেছ
কী জানো তাঁর নাম?
খোকা নামের একটি ছেলে
টুঙ্গিপাড়ায় গ্রাম।
সেই ছেলেটার বল ভরসায়
উঠল জাতি জেগে
পালিয়ে গেল পাক সেনারা
বাংলা দ্রুতবেগে।
বাপের বেটার সাহস কত
তার ছিল না ভয়
ইতিহাসে তাই চিরদিন
শেখ মুজিবের জয়।
বাপের বেটা শেখ মুজিবুর
বুকে সাহস রাখা
সব বাঙালির হৃদয় পটে
রংতুলিতে আঁকা।

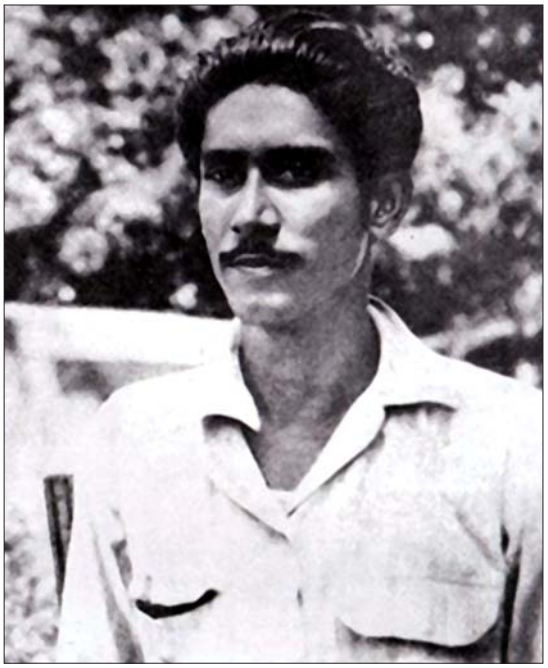

গল্প

খোকা'র সাহস

আঁখি সিদ্দিকা

ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলে এসে সেই থেকে খোকা পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে।

ছেলেটাকে নিয়ে আর পারি না আমি। রাগে গজগজ করতে করতে রান্নাঘর, গোয়ালঘর, কাছারি ঘর করছে মা।

কী হয়েছে খোকার মা?

কী আর হবে? তোমার ছেলেকে নিয়ে আমি আর পারছি না। রোজ একটা না একটা আছে তার।

আবার কী করেছে?

কী করে না? কোন পুল ভাঙছে, তার দৌড়ে সেটা সারতে যেতে হবে। যার বাড়িতে যে সমস্যা সেই বাড়িতে তোমার ছেলে গিয়ে হাজির। কাল ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলা হয়েছে। সব বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলে রাত জেগে খেলে আসলো।

ভালো তো!

পরশু বিকেলে কী কাণ্ড করেছে তুমি তো জানো না! তুমি তো বাড়িতে ঠিকমতো থাকো না। খবরও রাখো না।

কী? কী করল আবার?

বাঁধের পাশে একটা দোয়েলের বাচ্চা পা ভেঙে পড়েছিল। স্কুল থেকে ফেরার পথে সে পাখিটা কোলে করে বাড়ি ফিরে দাদির কাছ থেকে হলুদ, তেল আর কাপড় নিয়ে সেই পা বেঁধে সারা দুপুর বুকে করে ঘুরেছে। দুপুরেও খেয়েছে ও পাখিটাকে কোলে করে। বিকালে ওরা খেলতে ডাকলে সে পাখিটা খোপে ঢুকিয়ে খেলতে গেছে। মিনু মুরগি উঠাবে বলে দরজা খুলে দিয়েছে, মিঞা বাড়ির বিড়াল এসে সেই পাখি খেয়ে ফেলেছে। বাড়ি ফিরে সেই বিড়ালের পেছনে ধাওয়া করেছে সারা টুঙ্গিপাড়া। বোঝো অবস্থা?

বেশ তো। আমার খোকা বড়ো হয়ে জনদরদি নেতা হবে। যে পশুপাখি ভালোবাসে খোকার মা সেই তো মানুষ ভালোবাসতে পারবে।

খোকা চোখ ডলতে ডলতে বাবা-মায়ের কথার মধ্যে হাজির। বাবা জড়িয়ে ধরে খোকাকে বলল, চল খেজুরের রস পাইড়ে নিয়ে আসি।

বাবা, আজ স্কুলে তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

ক্যান বাপ?

আজ স্কুল পরিদর্শনে আসবে।

কে আসবে?

ওই যে তুমি শোনো নাই, বাংলার বাঘ শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক, নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

তাইলে তোমারে আইনা ভুল করলাম।

না আমি দুইটা ঠিলা নামাইয়া চলে যাবো। আজ পরিষ্কার জামা পরে যেতে হবে।

আচ্ছা! পা চালাইয়া চলো।

স্কুল মাঠে সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রধান শিক্ষক বুঝিয়ে দিচ্ছেণ। কার কী করতে হবে। কোনো ছেলে-মেয়ে যেন বাড়তি কথা না বলে। গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলের কিন্তু একটা আলাদা নাম আছে। সবাই যেন মনে রাখে।

মুজিবুর রহমান তুমি, ফজলুল হক স্যারকে ফুল দেবে, আর খালেদ তুমি দেবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্যার কে। জানো তো ওনারা অনেক বড়ো মানুষ।

হ্যাঁ স্যার (একসাথে বলে উঠল)।

সবাই এক এক করে ক্লাসে ঢুকল। দুপুর একটার দিকে নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক আসলেন। প্রধান শিক্ষকের কথামতো আমাদের সবার প্রিয় খোকা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার বাঘ ফজলুল হক কে ফুল দিলেন।

সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান শেষ হলো। স্যার'রা সবাই তাদের এগিয়ে দিতে গেট পর্যন্ত যাচ্ছেন। হঠাৎ করে দেখেন গেটের কাছে শেখ মুজিব আরো কয়েকজন তার ক্লাসের বন্ধুদের নিয়ে গেট আটকে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রধান শিক্ষক একটু ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, কী ব্যাপার মুজিব? তুমি এখানে? কী করো? সরে দাঁড়াও।

স্যার, আমরা অতিথিদের সাথে একটু কথা বলব।

প্রধান শিক্ষক আরো রেগে গিয়ে বললেন, তোমাদের আবার কী কথা?

নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এগিয়ে এসে প্রধান শিক্ষককে থামিয়ে দিয়ে বললেন, বলতে দিন ওদের।

আমাদের খোকা মানে শেখ মুজিব এগিয়ে এসে নেতাদের বুঝিয়ে বলল, তাদের একমাত্র ছাত্রাবাসের দুরাবস্থার কথা। অনেক দূর থেকে ছাত্ররা এসে কী যে দুর্ভোগ পোহায়। আর টিনের চাল দিয়ে বৃষ্টি হলেই পানি পড়ে। এত সুন্দর করে বুঝিয়ে বলল যে, নেতারা অবাক হয়ে গেলেন এই ছোট্ট সাধারণ ছেলেটির কথা আর তার সাহস দেখে।

ফজলুল হক এগিয়ে এসে জানতে চাইল তুমি কোন বাড়ির ছেলে বাবা?

শেখ বাড়ি।

অনেক বড়ো হবে তুমি। অনেক বড়ো মানুষ হও।

জননেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাকে অনেক দোয়া করলেন। স্কুলের সব শিক্ষকরা অবাক হয়ে গেল মুজিবের এই সাহস দেখে। তারা এই সমস্যা ভয়ে নেতাদেরকে বলতে পারেনি। কিন্তু তা মুজিব করে দেখাল। স্কুলে, পাড়ায়, খেলার মাঠে এভাবেই খোকা সাহসের সাথে কাজ করে। মা একটু বকা দিলেও সব্বাই খোকাকে অনেক আদর করে।

কিছুদিনের মধ্যেই গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে নতুন ছাত্রাবাস তৈরি হলো। খোকা আবার নতুন উদ্যমে নতুন কোনো কাজ শুরু করে দিয়েছে। ■

একাত্তর

কাওছার মজুমদার

তখন সময় করুণ ছিল,
ছিল সবাই ত্রস্ত,
পাকহায়েনার অত্যাচারে
সবাই বিপর্যস্ত।

দুঃসাহসী বীর-বাঙালি
মায়ের দামাল ছেলে ,
অমানিশা কাটার জন্য
মরল হেসে-খেলে।

ভয় করেনি বীর-মাতারা
পাকহায়েনার খড়্গ,
মা-বোনেরা আবরুহারা
হলেন যে উৎসর্গ।

পাকহায়েনার পরাজয়ে
থামল রণতূর্য,
বীরের ত্যাগে অবশেষে
হাসলো ভোরের সূর্য।

আমরা পেলাম লাল-সবুজের
একটি পতাকা,
যে পতাকায় সবুজ-শ্যামল
ভবিষ্যৎ আঁকা।

ত্রয়োদশ শ্রেণি, আল আমিন মাদ্রাসা, মাইজদী, নোয়াখালী।

কবিতায়
স্বাধীনতা

স্বাধীনতা ছাড়া

এমরান চৌধুরী

চোখের পলকে থেমে যেতে পারে
সব কোলাহল সাড়া
স্বাধীনতা ছাড়া।

স্বাধীনতা ছাড়া সূর্য ওঠে না
ফুলেরা ফোটে না
পাখিরা গায় না গান,
রাস্তার বাঁকে তড়পাতে থাকে
তুখোড় নওজোয়ান।

স্বাধীনতা ছাড়া মায়েরা হাসে না
ভালোও বাসে না
বাবারা ডাকে না খোকা,
পাখির পালক খোঁজে না বালক
যেন সে অবোধ-বোকা।

চোখের পলকে ঢেকে যেতে পারে
আকাশের সব তারা
স্বাধীনতা ছাড়া।

স্বাধীনতা ছাড়া ফসল ফলে না
জীবন চলে না
হাটুরে ফেরে না বাড়ি,
বাতায়ন পাশে দোলে না বাতাসে
গুবাক তরুর সারি।

স্বাধীনতা ছাড়া মনের আকাশ
হয় না বিকাশ
কে যেন পেছনে তাড়া,
করে দিনরাত - হয় না প্রভাত
সূর্যের হাতছাড়া।

স্বাধীন নামের পাখি

নজমুল হক চৌধুরী

স্বাধীন মানে মুক্ত হাওয়া
মুক্ত পাখির ডানা,
স্বাধীন মানে আমার কাজে
করবে না কেউ মানা।

স্বাধীন মানে মুক্ত স্বদেশ
মুক্ত দেশের সব-ই,
স্বাধীন মানে মনের কথা
বলবে দেশের কবি।

একাত্তরে তাই এনেছি
স্বাধীন নামের পাখি,
আয় না সবাই সেই পাখিকে
যত্ন করে রাখি।

মোদের গরব

নিতু চৌধুরী

এখন দেশটা স্বাধীন আমাদের
১৯-এর রূপ
তখন দেশটা পরাধীন ছিল
৭১-এর শোক

এই দেশের মুক্তি সেনারা
যুদ্ধ করেছিল
যুদ্ধ করে সেদিন তারা
মুক্তি এনেছিল

আমরা এখন স্বাধীন দেশের
স্বাধীন একটি জাতি
এই গরব মনে নিয়ে
এগিয়ে চলতে থাকি...

ষষ্ঠ শ্রেণি, মাওনা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীপুর, গাজীপুর

যুদ্ধদিনের কথা

খন্দকার মাহমুদুল হাসান

হঠাৎ করেই খুব কাছ থেকে শোনা যেতে লাগল স্লোগানের আওয়াজ। ক্লাসে থাকা ছাত্রদের মধ্যেও শুরু হলো উত্তেজনা। তাহলে কি আমাদের স্কুলের ভেতরেই শুরু হয়ে গেল মিছিল?

আমাদের ক্লাস চলছিল দোতলায়। আওয়াজ আসছিল নিচ থেকে। দোতলার ক্লাসরুমগুলোর সামনে ছিল টানা বারান্দা। ক্লাসে তখনো শিক্ষক আসেননি। স্কুলটা ছিল ছেলেদের। অর্থাৎ শুধুই ছাত্র ছিল এবং কোনো ছাত্রী ছিল না। ক্লাসে শিক্ষক না থাকায় ছেলেরা ছিল স্বাধীন। তাই হই হট্টগোলে বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না। ফ্রি স্টাইল চেঁচামেচি চলছিল। সেই আওয়াজকে ছাপিয়ে যখন বেশ জোর আওয়াজ নিচের দিক থেকে এল, তখন বুঝলাম অনেক মানুষের জমায়েত সেখানে হয়েছে। ওই আওয়াজের ধাক্কায় থেমে গেল ক্লাসের হট্টগোল। সবাই একযোগে কান খাঁড়া করল। তারপর একসাথে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এল বারান্দায়। সেই দলে আমিও ছিলাম। দেখলাম, নিচের বারান্দা ও মাঠ জুড়ে ক্লাস টেন-এর বড়ো ভাইদের জমায়েত। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে

আমাদের মতো সেভেন- এইট-এর ছাত্ররা। এমন পরিস্থিতিতে কী করা উচিত তা জানা ছিল না আমাদের। তাই আমরা ওখানে দাঁড়িয়েই পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম। অবশ্য খুব বেশিক্ষণ সুযোগ জুটল না। আমাদের মতো অন্যান্য ক্লাসের ছেলেরাও বারান্দায় ভিড় জমিয়েছিল। সেসব ক্লাসেও শিক্ষক ছিলেন না। তাই দেখে নিচ থেকে ডাকাডাকি শুরু হলো। আমরা নেমে এলাম।

তবে ক্লাস চলাকালীন সময়ে এমন ঘটনা একেবারেই বিরল। দেখতে দেখতে সব ক্লাস থেকেই ছাত্ররা বাইরে চলে এল। স্যাররাও টিচার্স কমন রুমে এসে জমায়েত হলেন। মাঠ জুড়ে ছাত্ররা, কমন রুমে শিক্ষকরা। আমরা উঁকিঝুঁকি মেরে দেখলাম। স্যারেরা খুব গুরুত্বের সাথে কোনো বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। ছোটো ক্লাসের ছেলেরা ঘটনা বোঝার চেষ্টা করছে। আমি অবশ্য একটু একটু বুঝছি। কারণ আমাদের বাসায় প্রতিদিনই সংবাদপত্র আসত। মা- বাবার সাথে সাথে আমিও নিয়মিত পড়তাম। ফলে দেশের পরিস্থিতি যে গুরুতর তা অনুমান করতে পারছিলাম। আজকের এই জমায়েত যে তারই ফলাফল তাও বুঝতে পারছিলাম।

সাথে সাথে শুরু হলো স্লোগান, ইয়াহিয়ার বুকে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

ক্লাস টেন-এর বড়ো ভাইয়েরা স্লোগান দিচ্ছিলেন। এর মধ্যে একজন স্লোগান থামিয়ে বললেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করেছেন। তেইশ বছর ধরে তারা আমাদের শোষণ করেছে। এখন ছলচাতুরী শুরু করেছে যাতে বাঙালির হাতে কিছুতেই ক্ষমতা না আসে। আমরা আর এই অন্যায় মেনে নেব না। সাথে সাথে শুরু হলো স্লোগান, ইয়াহিয়ার বুকে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

বড়ো ভাইদের নেতৃত্বে শুরু হলো ছাত্র মিছিল। শহরের বড়ো সড়ক ধরে চলল মিছিল। ক্লাস আর হলো না। বইখাতা বগলদাবা করে ছুটলাম মিছিলে। স্লোগান দিলাম, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর। তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা - মেঘনা - যমুনা। জয় বাংলা।

আরো স্লোগান দেওয়া হচ্ছিল, তবে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর' স্লোগানটার মধ্যে একটা বিশেষ উত্তেজনা ছিল। আর ছিল যুদ্ধের আহবান।

মিছিল শেষে দুপুরের দিকে বাসায় ফিরলাম। মাকে বললাম সবকিছু। শুনে মা একটু ভয় পেলেন। মিছিলে গিয়ে আবার কোন বিপদে পড়ি এ নিয়ে তার দুশ্চিন্তা শুরু হলো। কারণ উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের স্মৃতি তখনো বেশ টাটকা। সেই গণ অভ্যুত্থানের মিছিলে গিয়ে মার খেয়ে এসেছিলাম। নাক ফেটে গিয়েছিল। দরদর করে রক্ত ঝরছিল। ফাটা নাক ফুলে টেনিস বলের মতো হয়েছিল। আমি যন্ত্রণায় খুব কাতরেছিলাম। মা তো আর সেই স্মৃতি ভুলতে পারেন না। মিছিলের কথা এলেই সেই স্মৃতি বার বার তাড়া করে ফেরে তাঁকে।

বিকেলের দিকে খেলতে গেলাম। কিন্তু খেলব কী। সেখানেও ওই একই আলোচনা। আমাদের বয়েসি ছেলে-মেয়েদের আর রাজনীতি সম্পর্কে কতটুকুই বা ধারণা। কিন্তু দেশে গুরুতর কিছু একটা যে ঘটতে চলেছে তা বুঝতে বাকি ছিল না কারোরই। রোজই মিছিল হচ্ছিল। স্লোগানগুলোও ছিল একই ধরনের। খেলার মাঠের সবাই মিলে ঠিক করল, আমরাও মিছিল করব। আমাদের দলে শুধু ছেলে ছিল না, মেয়েও ছিল। সবাই মিলেই মিছিল বের করলাম। আমরা অবশ্য বড়ো রাস্তায় যাইনি। মাঠ এবং তার আশপাশের রাস্তাতেই চলল আমাদের মিছিল। আমাদের সেই মিছিলেরও প্রধান একটা স্লোগান ছিল, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।

দেখতে দেখতে পরিস্থিতি আরো অনেক জটিল হলো। বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণ দিলেন। বাবা তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে বসে বিদেশি বেতারের অনুষ্ঠান শুনতেন। শোনার পর ঘটনার গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতেন। এখানে একটা কথা বলে রাখি, আমার বাবা ছিলেন ভাষা সৈনিক, মানে ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। দেশ নিয়ে তাঁর একটা আলাদা ভাবনা ছিল। সেসব ভাবনা নিয়ে বাসায় আলোচনা চলত। দেশের রাজনৈতিক

পরিস্থিতি জটিল হতে শুরু করায় ক্লাস পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে এক সন্ধ্যায় রেল স্টেশনে গিয়েছি রেলওয়ে বুক স্টল থেকে পত্রিকা কিনতে। মার্চ মাসের সন্ধ্যা। দিনে একটু গরমও পড়েছিল। এখন মৃদু হাওয়া বইতে শুরু করেছে। প্লাটফর্মের পাশে ওয়েটিং রুমের বাইরে লাল রঙের দেয়ালে টানানো ট্রিট ব্লেডের বিজ্ঞাপন দেখছিলাম। বিজ্ঞাপনটার বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সেটা কাগজে ছাপানো কোনো বিজ্ঞাপন ছিল না। জিনিসটা ছিল অনেকটা বিলবোর্ডের মতো।

দেয়ালের গায়ে মজবুত করে লাগানো থাকত পুরো কাঠামো। টিনের উপরে প্রিন্ট করা সেই বিজ্ঞাপনের ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল হলুদ রঙের। আর তাতে কালো আর সাদা রঙের মোটা হরফে ওই বিজ্ঞাপনের গুণকীর্তন করা ছিল। শৈশব-কৈশোরের ট্রেন যাত্রাকালে রেল স্টেশনে গাড়ি থামলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে এসব বিজ্ঞাপন দেখতাম। যেহেতু তখনকার সময়ের চেয়ে মাত্র তেইশ বছর আগেই ছিল ব্রিটিশ আমল। তাই ব্রিটিশ আমলেরও অনেক রকম 'টিনের বিজ্ঞাপন' তখনো ছিল। সেসব বিজ্ঞাপনের ভাষা ছিল বাংলা, ইংরেজি, উর্দু ও হিন্দি। এর মধ্যে একটা ছিল চায়ের বিজ্ঞাপন। কোনো বিশেষ চা কোম্পানির বিজ্ঞাপন সেটা ছিল না। বরং চা খেলে কী কী উপকার হয় সেসবের কথা লেখা ছিল ওই বিজ্ঞাপনে। তাতে কাপ ভরা ধোঁয়া ওঠা চায়ের ছবি, চা বানানোর নিয়ম... এইসব ছিল। গভীর মনোযোগের সাথে বিজ্ঞাপন দেখছিলাম এবং পড়ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ করেই মহা কোলাহলের শব্দ কানে এল।

ওয়েটিং রুমের সামনের বারান্দা থেকে উঠে এলাম প্লাটফর্মে। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পষ্ট হলো শব্দ। মিছিল আসছে। স্লোগান শোনা যাচ্ছে, ভুট্টোর বুকে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। ইয়াহিয়ার বুকে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ। বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর। তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা - মেঘনা - যমুনা। জয় বাংলা।

কাছে আসতেই দেখলাম, গ্রামের দিক থেকে আসা এ মিছিলের প্রত্যেকের হাতে বাঁশের লাঠি। মিছিল চলে যাবার পর আমিও চলে এলাম।

পরদিন যেহেতু ক্লাস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তাই বাসায়ই রইলাম। বাবা বললেন, ক্লাসে যেতে হচ্ছে না বলে ঘুমিয়ে কাটানো চলবে না। বইগুলো শেষ করো।

আমিও সেই অনুযায়ী বইপুস্তকের দিকে একটু নজর দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। বেলা তখন সাড়ে এগারোটার মতো বাজে। আবারও সেই গমগমে আওয়াজ। আমরা যে সরকারি বাসায় থাকতাম সেটা ছিল একটা ডুপ্লেক্স, মানে দোতলা বাড়ি। আমি বাড়ির ভেতরের দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে একটা বই হাতে বসেছিলাম। আওয়াজ কানে যেতেই দোতলায় উঠে সামনের সিঁড়ির দিকে ছুটলাম। দেখলাম, দূর থেকে মিছিল আসছে। একটু পরেই মিছিলটা আমাদের বাসার সামন দিয়ে চলে গেল। দেখলাম, মিছিলে সবার হাতে লাঠি। বুঝলাম, বাঙালি এবারে জেগে উঠেছে। তাদের হাতে আধুনিক কোনো অস্ত্র নেই, কিন্তু বাঁশের লাঠি নিয়েই যুদ্ধ করতে তৈরি তারা। পরিস্থিতি প্রতিদিনই বদলাতে শুরু করেছে। ঢাকা শহরের কিছু জায়গা বাদে সারা দেশে কোথাও টেলিভিশন দেখার ব্যবস্থা ছিল না। মোবাইল ফোনের কথা কল্পনাতে আনারো উপায় ছিল না। টেলিফোন খুবই সীমিত পর্যায়ে ছিল। রেডিও আর সংবাদপত্রই ছিল খবর জানার নির্ভরযোগ্য উপায়। যতই দিন যেতে লাগল পথঘাটের অবস্থা ততই বেশি খারাপ হতে লাগল। ফলে সংবাদপত্র আসা অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। এমনিতেই মফস্বলে ঢাকার দৈনিক পৌঁছাতে পৌঁছাতে কোনো জায়গায় বিকেল, আবার কোথাও কোথাও রাত, কোথাও বা পরদিন দুপুর হয়ে যেত। আজকের দিনের মতো ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবর প্রচারের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই রেডিওর নির্দিষ্ট সময়ের খবরই ছিল ভরসা। মানুষও হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল রেডিওর উপর। আরো একভাবে অবশ্য খবর পাওয়া যাচ্ছিল। সেই মাধ্যমটার উপরেও বেশ আগ্রহ দেখতাম অনেকেরই। সেটা ছিল লোকমুখে পাওয়া খবর। মানে, একজন চট্টগ্রাম থেকে কুষ্টিয়া গেল, সে গিয়ে চট্টগ্রামের ঘটনা বর্ণনা করল। এভাবে পাওয়া খবরের সত্যতা যাচাই করাটা খুব কঠিন ছিল। আসলে সত্যতা যে কে যাচাই করত তাই বা কে জানে। আসলে এইভাবে পাওয়া খবর ছিল গুজব সৃষ্টির মস্ত উপাদান। তাই সত্য খবর যেমন ছিল, তেমনি ছিল

গুজবের ফুলঝুরি। কিন্তু মানুষ সত্য খবর ঠিকই খুঁজে বের করত। সেই সত্য খবর প্রধানত পাওয়া যেত রেডিওর মাধ্যমে। পাকিস্তান সরকারের প্রচারণায় মানুষের কোনো আস্থা ছিল না। তাই তারা বিবিসি আর ভয়েস অব আমেরিকার খবর শুনত। আর শুনত আকাশবাণীর খবর, মানে ভারতীয় বেতারকেন্দ্রের খবর। কেউ কেউ মনে করেছিলেন, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের যে আলোচনা চলছিল তাতে কোনো একটা ফল হবে।

আবার অনেকেই বুঝতে পারছিলেন, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই হবে। মানুষ মনে মনে স্বাধীনতার জন্যই তৈরি হচ্ছিল। তার লক্ষণও বেশ আগে থেকেই প্রকাশ পেতে দেখছিলাম। উনসত্তর-সত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে দেখেছি পথে পথে মানুষের ঢল। খালি পায়ে আমরা স্কুল থেকে ফুল নিয়ে ভোরে গেছি শহিদমিনারে। আমি বাসার সামনে ফুল বাগান করতাম। সেখান থেকেও ফুল নিয়ে গেছে বন্ধুরা। এ নিয়ে আমি পরে 'আত্মদান' নামে একটা গল্পও লিখেছিলাম। একুশে ফেব্রুয়ারিতে পথে কেউ জুতো পরত না, ভাষা শহিদদের সম্মানে।

মনে আছে, এক রিকশাচালক স্যান্ডেল পরে রিকশার প্যাডেলে পা দিয়েছিল। অমনি অন্য রিকশাচালকরা তাকে বাধা দিয়েছিল। ফলে সে খালি পায়ে রিকশা চালাতে বাধ্য হয়েছিল। আলকাতরা নিয়ে দলে দলে ছাত্ররা চলে যেত সব সাইনবোর্ড থেকে বাংলা ছাড়া অন্য সব ভাষা মুছে দিতে। এমন বহু ঘটনার আমি সাক্ষী শুধু নই, অংশগ্রহণকারীও। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু ও মাওলানা ভাসানীকে সামনাসামনি ও খুব কাছ থেকে দেখার স্মৃতিও মনে পড়ছে। সাদা পাঞ্জাবি পরা মাওলানা ভাসানীকে হাত উঁচিয়ে জোর গলায় বক্তৃতা দিতে দেখেছি আয়ুব আমলে। সত্তরের নির্বাচনী সভায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণে শুনেছি পাকিস্তানি শোষণের বর্ণনা। বাহাত্তরে তাঁকে একবার গার্ড অব অনার নিতে, আর দুবার ভাষণ দিতে দেখেছি। জনসভাগুলো ছিল লোকে লোকারণ্য। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় ছিল সে বক্তৃতা।

১৯৭১ সালের মার্চ মাস জুড়েই চলছিল প্রবল উত্তেজনা। তাই উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যেই এল ১৯৭১ সালের ভয়াল ২৫শে মার্চের কালরাত। সেই রাতে তো আমরা কোনো খবরই জানতে পারিনি। ঢাকা থেকে আমাদের অবস্থানস্থল কুষ্টিয়া জেলা পর্যন্ত খবর এসে পৌঁছানো কোনো সোজা ব্যাপার ছিল না। বিদেশি বেতারকেন্দ্রের মাধ্যমে পরদিন যখন খবর পৌঁছালো তখন তো হাহাকার করে উঠল মানুষ। দু এক দিনের মধ্যেই ঢাকা ও চট্টগ্রামের আরো খবরাখবর এল। দেশের অন্যান্য জেলার খবরও আসতে শুরু করল।

বীর বাঙালি অস্ত্র ধর,
বাংলাদেশ স্বাধীন কর।

তোমার আমার ঠিকানা,
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা।

জয় বাংলা।

শুরু হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধ। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআরবাহিনী, আনসারবাহিনী, মুজাহিদবাহিনী ও পুলিশবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলাদেশের পক্ষ নিল। বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক বাঙালি সৈনিক আমাদের এলাকায় যুবকদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করলেন। তখনো বাঙালিদের হাতে তেমন অস্ত্রপাতি ছিল না। তাই ট্রেনিং নিতে অনেকেই রাইফেলের বদলে লাঠি হাতে এসেছিলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যমুনা নদী পার হয়ে পাকিস্তানি বাহিনী উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার পাবনা জেলার নগরবাড়ি ঘাটে এসে পৌঁছাল। সেই খবর রেডিওতে যেমন শোনা গেল, তেমনি শোনা গেল প্রাণ ভয়ে পালিয়ে আসা মানুষের মুখেও।

দিন যতই এগোতে লাগল পরিস্থিতি ততই বিভীষিকাময় হয়ে উঠতে লাগল। বড়ো শহরগুলো থেকে স্রোতের মতো পালাতে লাগল মানুষ। কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারায় দেখলাম, মানুষের অন্তহীন স্রোত বানের জলের মতো ধেয়ে আসছে। এরা আসছে পাবনাসহ উত্তরবঙ্গের নিকটবর্তী এলাকাগুলো থেকে। ছোটো ছোটো শিশুরা হাঁটতে পারছে না। ক্লান্তিতে ঢলে পড়ছে। চোখেমুখে তাদের আতঙ্ক। পেছন থেকে মৃত্যু তাদেরকে ধাওয়া করে আসছে। ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে মেশিনগানের একটানা বটবট আওয়াজ। বিমান থেকে বোমা ফেলার বুম বুম শব্দ।

ধোঁয়া, আগুনের শিখা, মানুষের হাহাকার সবই এসে হাজির হলো নিজের চোখের সামনে। বেশ কয়েকজন বিদেশিকেও দেখেছি লোকজনকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করতে, ইন্ডিয়া কোন দিকে ? মানে তারা ভারতে যাবার রাস্তা খুঁজছে।

তখন পাকিস্তানি বাহিনী ব্রাশ ফায়ার করে বাঙালি হত্যা করতে করতে আর বাড়িঘর জ্বালাতে জ্বালাতে এগিয়ে আসছে। সেই মহাবিপদের দিনে বাঙালিদের মধ্যে যে সাহস দেখেছি তা ভুলতে পারব না। বিমান বাহিনীর সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসছিল পাকিস্তানি বাহিনী। তারা যখন পাকশি ঘাট পার হয়ে ভেড়ামারার মাটিতে নামবে, তখন তাদেরকে ঠেকানোর জন্য কয়েকটা মাত্র থ্রি নট থ্রি রাইফেলকে সম্বল করে ট্রাকে চড়ে আনসার-মুজাহিদ বাহিনীর বাঙালি সৈনিকদেরকে ঘাটের দিকে ছুটে যেতে দেখেছি। জানি না সেই বীর দেশপ্রেমিকদের কারও জীবন রক্ষা পেয়েছিল কিনা।

তবে শেষ পর্যন্ত এই শহরটাও ছাড়তে হলো আমাদের। আমরা সীমান্তের আরো কাছাকাছি একটা গ্রামে গিয়ে ঠাঁই নিলাম।

পাকিস্তানি বাহিনী গোটা বাংলাদেশে কায়েম করল ভয়ের রাজত্ব, অত্যাচারের রাজত্ব। এরই মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলো। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ বেতারে ভাষণ দিলেন জাতির উদ্দেশে। একটা বড়ো আমবাগানে বসে সেই ভাষণের খবর শুনেছি রেডিওতে। যদিও আমরা ছিলাম ছোটোদের দলে, তাই বড়োরা সবকিছুতে আমাদের সংশ্লিষ্ট করতেন না। তবু বড়ো কোনো ঘটনার কথা জানতে পারলেই ছুটে যেতাম। একদিন আমবাগানে গিয়ে কয়েকজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে দেখা। তাদের হাতে বেশ ছোটো আকারের অস্ত্র দেখলাম। যুবকরা যে মুক্তিযোদ্ধা তা বুঝতে দেরি হয়নি, কিন্তু অই অস্ত্রটা আগে কখনো দেখিনি বলে ওটার ব্যাপারে প্রবল কৌতূহল ছিল। অবশ্য কৌতূহল মিটতে সময় লাগল না তেমন। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছেই জানা গেল, 'হাতিয়ার' টার নাম স্টেনগান। সেই প্রথম আমার স্টেনগান দর্শন।

গ্রামটা ছিল মুক্তাঞ্চল। তবে কয়েক কিলোমিটার (তখন অবশ্য মাইলের হিসাব প্রচলিত ছিল) গেলে সীমান্তের দিকে চলে যাওয়া পাকা সড়কের দেখা মিলত। সেই সড়ক ধরে মিলিটারির গাড়ি যেত। এই গ্রামে সমবয়েসি ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছিল। সেইসব নতুন বন্ধু নিয়ে গাছপালার আড়াল থেকে বিপজ্জনক প্রাণী 'মিলিটারি' দেখতেও গেছি। বড়ো হয়ে আমার এক বন্ধু অরুণ কুমার দাসের কাছে শুনেছি, সেও মা-বাবার সাথে আশ্রয় নিয়েছিল সীমান্ত ঘেঁষা এলাকায়। তবে সেটা ছিল সীমান্তের ওপারে। আগরতলার কাছে যেখানটায় তারা ছিল, সেখান থেকে কামান তাক করে বসে থাকা পাকিস্তানি বাহিনীকে দেখা যেত। ভারতীয় প্রতিবেশী বন্ধু নীলেশের সাথে মিলে সেও একইভাবে পাকবাহিনীকে দেখতে যেত। আসলে আমাদের বয়েসিদের সবার জীবনেরই গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল সেটা।

এই সময় বোমা, কামানের শেল, মেশিনগান, স্টেনগান, এলএমজি আর রাইফেলের গুলির আওয়াজের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখেছিলাম। মানে, আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারতাম কোনটা কিসের শব্দ। যুদ্ধ বেশ বেড়ে ওঠার সাথে সাথে আরেকটা নতুন শব্দের সাথে পরিচিত হলাম। সেটা ছিল ডিনামাইটের আওয়াজ। বেশ দূর থেকে আসা এসব আওয়াজ শুনে এবং ধোঁয়া উঠতে দেখে আমরা বুঝতে পারতাম কতটা দূরে ঘটছে ঘটনা। পাকিস্তানি মিলিটারি এবং মুক্তিযোদ্ধা সেজে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ- যুদ্ধ খেলাও খেলত ছোটো ছেলে-মেয়েরা। সেসব খেলা আমরাও খেলেছি। যুদ্ধযাত্রা কালে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র, রসদের বাক্স...এসব এগিয়ে দেওয়ার সময় কখনো ভাবিনি যে, এভাবে ইতিহাসের অংশ হয়ে যাচ্ছি। মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা তো নিত্যদিনের কাজ ছিল। যদিও নিজেরাই ছিলাম আশ্রিত, কিন্তু তখন মনে হতো এটা আমার নিজের গ্রাম। এ বাড়িও আমারই বাড়ি। এটা আমার নিজের দেখা উপলব্ধি যে, তখন মানুষ নিজেকে নিয়ে বিব্রত ছিল না। সকলেই নিজেকে উৎসর্গ করেছিল পরের তরে। সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং অনাত্মীয় মানুষকে ডেকে নিজ বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে, দিনের পর দিন মাসের পর মাস নিজে যা খেয়েছে তা ভাগ করে খাইয়েছে। সত্যি সত্যিই হিন্দু-মুসলমানের কোনো ভেদাভেদ ছিল না। ধনী-গরিবের ফারাক ছিল না। পরিচয় ছিল একটাই-

বাঙালি। দেশের মুক্তি ছাড়া আর কোনো চিন্তাই কারো মধ্যে দেখিনি। বাংলাদেশ স্বাধীন করতে হবে। তা না হলে পাঞ্জাবিরা (পাকিস্তানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা পাঞ্জাবি জাতির লোকেরাই ছিল) বাঙালিদের মেরে শেষ করে দেবে। পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বাঙালি নামের জাতিটা। তখন প্রতি রাতে বাবা এবং তাঁর বন্ধু স্থানীয়দের বিবিসির খবর শোনার সময় পেছনে গিয়ে দাঁড়াতাম। সব খবর মনোযোগ দিয়ে আমিও শুনতাম। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠান তখনই শুনেছি। বাবাকে সবাই সম্মান করত। মুক্তিযোদ্ধা-গ্রামবাসীদেরকে বাবার শোনানো অভয়বাণী আজও আমার কানে বাজে। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র এবং বিবিসির খবর ও তার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বলতেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময়টা ছিল ঘটনাবহুল। সবকিছু লিখতে গেলে এজন্য আলাদা একটা বই লিখতে হবে। তাই সবকিছু লেখার লোভ সংবরণ করতে হচ্ছে। তবু একটি ঘটনার কথা খুব মনে পড়ছে। সেটা যুদ্ধের একেবারে শেষের দিকের ঘটনা।

মুক্তাঞ্চল বাড়তে শুরু করেছে। পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে পাকবাহিনীর একটা দল গ্রামবাসীর নজরে পড়ে গেল। এই গ্রামটা ছিল একটু দূরে। আমরা একটা জায়গায় যাচ্ছিলাম। পথে পড়েছিল ওই গ্রামটা। অনেকটা কাকতালীয়ভাবেই আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মুক্তিযোদ্ধা-জনতার দলটা বড়ো ছিল, কিন্তু অস্ত্রবলে শক্তিশালী ছিল পাকিস্তানিরাই। প্রথম গুলিটা মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকেই ছোঁড়া হলো। শুরু হয়ে গেল সম্মুখ সমর। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আমিও ছিলাম এবং মাথার চুল স্পর্শ করে গুলি চলে গেছে। মাটির সাথে বুক মিশিয়ে প্রাণ রক্ষা হলেও তা ছিল বরাতজোর কিংবা যমের অরুচি। আমরা ছিলাম নদীর নিচের দিকের ঢালে। আর শত্রুপক্ষ ছিল উঁচু পাড়ের আড়ালে। অবস্থানগত সুবিধার পুরোটুকুই তাদের ছিল। আমাদের নির্ঘাত মৃত্যু হবার কথা ছিল। তবু স্রেফ বরাতজোরে বেঁচে যে গেলাম তার আসল কারণ, আমাদের পক্ষে ছিল নিরঙ্কুশ জনসমর্থন, আর পাকিস্তানিদের জানা ছিল যে যুদ্ধে জিতলেও তারা পালিয়ে যেতে পারবে না। সারা দেশের মানুষ তাদের বিপক্ষে। এর উপর যুদ্ধক্ষেত্রকে অনেক দূর দিয়ে ঘিরে রেখেছিল সাধারণ গ্রামবাসী। তাদের মুহুর্মুহু 'জয়বাংলা' স্লোগানে কেঁপে উঠছিল আকাশ-বাতাস। পাকিস্তানিরা ভয় পেয়েই সেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পালাতে তারা পারেনি। জয় হয়েছিল বাঙালির।

এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনী চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল ঢাকায়। মানুষের সে কী বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। ■

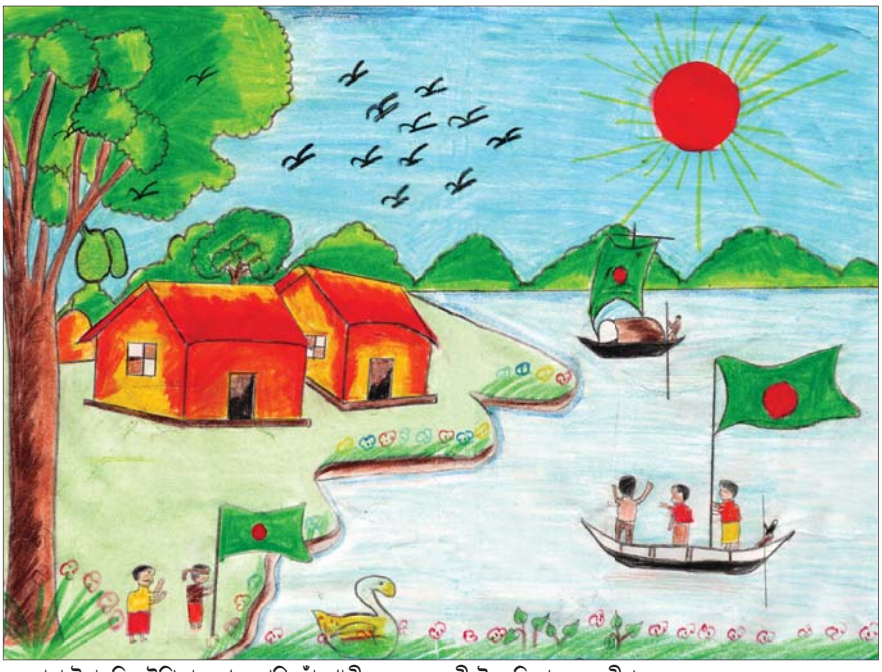

সুলতানা ইয়াসমিন ঈশিতা, সপ্তম শ্রেণি, চাঁদখালী এ,রব বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষ্মীপুর

যুদ্ধে শিশুরা কেমন হয়ে যায়

মেজবাউল হক

যুদ্ধ ও সংঘাতে সবচেয়ে বেশি নির্মমতার শিকার হয় শিশুরা। সেভ দ্য চিলড্রেনের এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, সশস্ত্র সংঘাতের ফলে সারাবিশ্বে ২০১৩ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত কমপক্ষে পাঁচ লাখ শিশু মারা যায়। গড়ে এ সংখ্যা দাঁড়ায় বছরে ১ লাখ শিশু। এছাড়াও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে শিশু-কিশোরেরা।

আরাকান থেকে ইয়েমেন, ফিলিস্তিন থেকে সিরিয়ায় চলছে শিশু নির্মমতা। যত রকমভাবে মানুষের শিশু অত্যাচার সম্ভব, এরা তার সবকিছুরই শিকার। সিরীয় শিশুরা যখন শরণার্থী নৌকায় পানিতে ডুবে মরছিল, তখন ইয়েমেনের শিশুরা মরছিল বোমায়। সিরীয় শিশুরা যখন ক্রসফায়ারে মরছিল, তখন ইয়েমেনের শিশুরা তিলে তিলে মরছে দুর্ভিক্ষে। ক্লাস্টার বোমা, রাসায়নিক বোমা, বিমানের বোমা, কামানের বোমা, ড্রোনের বোমায় কাঁপছে শিশুদের বুক।

ইয়েমেনে যোদ্ধাদের এক তৃতীয়াংশই শিশু! এই শিশু সৈনিকরা দারিদ্র্যের কারণে যুদ্ধে যাচ্ছে এমনটি নয়, যাচ্ছে বাধ্য হয়ে। শিশুদের যুদ্ধে পাঠানোর কারণে অনেক স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে শিক্ষাহীন এসব শিশুদের আক্রমণাত্মক মনোভাব তৈরি, চোখে মুখে প্রতিরোধের বহিঃপ্রকাশ, ভয়হীন জীবন কাটানো, দুঃসাহিসকতার প্রতিচ্ছবি তাদের মাঝে দেখা মিলে। তাই একটি যুদ্ধ একটি দেশের আগামীর কাণ্ডারিদের ধ্বংস করে, বেড়ে উঠে মেধাহীন প্রজন্ম। এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে, যুদ্ধ ও সংঘাতের পরোক্ষ প্রভাব যেমন–ক্ষুধা, দারিদ্র্য, ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো (হাসপাতাল), স্বাস্থ্যসেবা ও সাহায্যের দুষ্প্রাপ্যতা, পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার খারাপ অবস্থা ইত্যাদি কারণে শিশুমৃত্যু ঘটে। 'সেভ দ্য চিলড্রেন' বলছে, সংঘাতপ্রবণ ও সংঘাতপূর্ণ এলাকায় জন্ম না নিলে বা ওই এলাকায় এ শিশুরা না থাকলে হয়ত তাদের মৃত্যু ঘটত না। রিপোর্টটিতে আরো জানায়, বর্তমানে পাঁচজনের মধ্যে একজন অর্থাৎ ২০ বছরের মধ্যে সর্বাধিকসংখ্যক শিশু সংঘাতপূর্ণ এলাকায় বাস করছে।

আফগানিস্তান, ইয়েমেন, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, কঙ্গো (ডিয়ারসি), সিরিয়া, ইরাক, মালি, নাইজেরিয়া ও সোমালিয়া ২০১৭ সালে সংঘর্ষের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ছিল। এই একুশ শতকে এসে যুদ্ধাবস্থায় শিশু ও বেসামরিক কাউকে লক্ষ্যবস্তু করা যাবে না, এ নীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে যুদ্ধ দেশগুলো।

বন্ধুরা, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৫শে মার্চ রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদেশের ঘুমন্ত মানুষের উপর। দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধে অনাহারে, অবহেলায় কত শিশুর জীবন যে বিপন্ন হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। মায়ের কোলে শিশু, পথেঘাটে পড়ে থাকা শিশুদের ছবি এখনো আমাদের চোখে ভাসে। তাই যুদ্ধ কখনো ভালো কিছু বয়ে আনে না। ■

জাতীয় গণহত্যা দিবস

অরুণিত ভোর

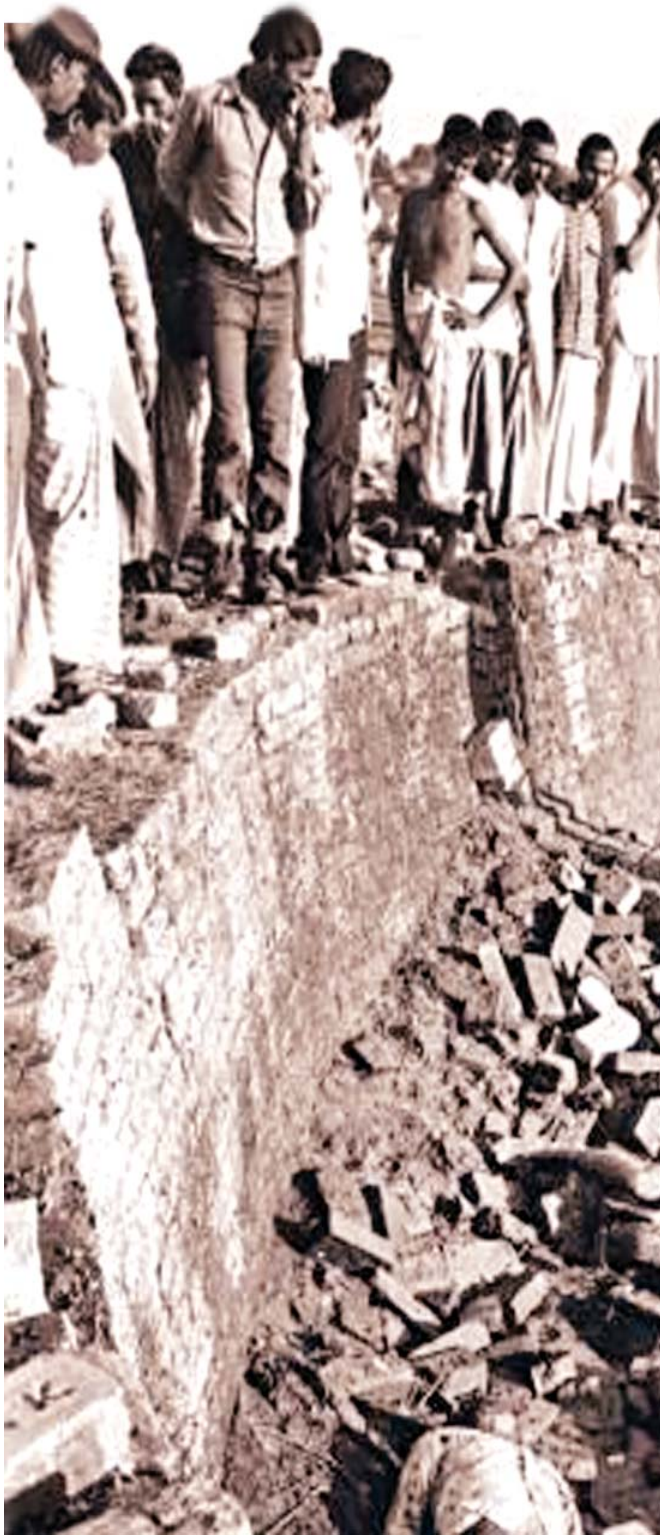

‘গণহত্যা’ শব্দটির সাথে ভালোভাবে আমার পরিচয় হয়েছিল ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে। শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে আম্মু ব্যাগ গুছিয়ে বাইরে যাচ্ছিল, আমি আম্মুকে গলা ধরে বললাম, আজ ছুটির দিন কোথায় যাও। আম্মু অফিস করে তাই শুক্রবার-শনিবার আমি আম্মুকে পাই। তখন আম্মু বলল, আমাদের খুলনায় ১৯৭১-গণহত্যা আর্কাইভ ও জাদুঘর হয়েছে। সেখানে নাকি আম্মুর কাজ আছে। আমি গণহত্যা কী জানতে চাইলে আম্মু বলল, কেন? তুমি বইয়ে পড়োনি? আমি জিভ কেটে বললাম ওহ! পড়েছি, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাত? আর ওইদিন অনেক মানুষ মেরেছিল পাক আর্মিরা। মা বললেন হ্যাঁ, আরো বিস্তারিত ফিরে এসে বলব। মা চলে গেলেন। মা ফিরে এলে আবারো প্রশ্ন করলাম রাতে। মা তখন ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন-‘গণহত্যা’ বা জেনোসাইড কী? তারপর আরো বিশদভাবে জানার জন্য মা আমাকে বই দিলেন। বই পড়ে তেমন না বুঝতে পেরে আমি অনলাইনে পড়া শুরু করি। আর আমার সেই জানার থেকেই এই বিষয়টা নিয়ে নবারুণে লিখতে উদ্‌বুদ্ধ হই।

‘গণহত্যা বলতে দুইয়ের অধিক বা অনেক মানুষ মেরে ফেলা বোঝায়। পারিভাষিক অর্থে কোনো দেশ, জাতি, গোষ্ঠী বা ভিন্ন মতাদর্শধারীদের খুন এবং মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করাই হলো গণহত্যা। ১৯৪৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত রেজ্যুলেশন ২৬০ (৩) এর অধীনে গণহত্যা বলতে বোঝানো হয়েছে এমন কর্মকাণ্ড যার মাধ্যমে একটি জাতি বা ধর্মীয় সম্প্রদায় বা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে’।

যখন জাতিগত ও ধর্মের কারণে অনেক মানুষকে হত্যা করা হয়। একটি দেশ যখন ঘোষণা দিয়ে একটি

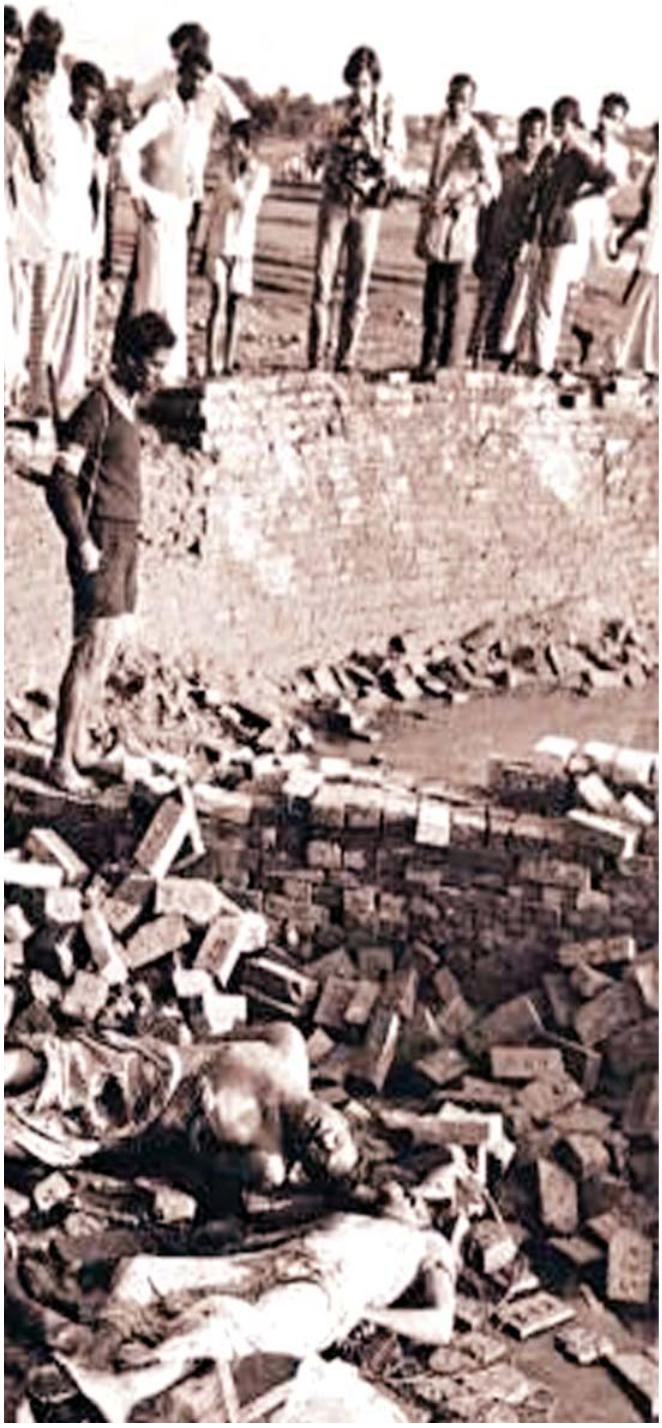

নির্দিষ্ট জাতিগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় তখন সেটি জেনোসাইড বলে বিবেচিত হতে পারে। জাতিসংঘের কনভেনশন তা-ই বলে।

বেছে বেছে বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীল গোষ্ঠীসহ বিশেষ মতাদর্শভিত্তিক একটি দল ও ধর্মীয় গোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন করার উদ্যোগ নেওয়ার কারণে জেনোসাইড আর্টিকেলের ২/ই ধারা অনুযায়ী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা যায়। নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ করে যে ব্যাপক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে হিন্দু গোষ্ঠীর ৬৯ লাখ (আগস্ট ১৯৭১-এর মধ্যে) মানুষকে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভীতিগ্রস্ত (traumatized) করে নদনদী, বনাঞ্চল ও জলাশয়ের মধ্য দিয়ে দেশছাড়া করা হয়েছিল। তাতে প্রায় ৫ থেকে ৬ লাখ হিন্দু নিশ্চিহ্ন হয় অথবা মৃত্যুদুয়ারে পৌঁছে। এতে ৪ লাখের মতো শিশুসহ মুসলিম জনগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন বা গুম হয়ে যায়। তারা আর কখনোই ফিরে আসেনি। এরা এমন এক কৃষ্ণ বিবরে নিমজ্জিত হয়েছিল যা থেকে কখনোই তাদের চিহ্নিত করা যায়নি। পরিবারের কাছে তারা নিখোঁজ হয়ে আছে। এতে জেনোসাইড আর্টিকেলে অন্তর্ভুক্ত ৬/সি (Genocide by deliberately inflicting conditions of life calculated to bring about physical destruction) ধারা অনুয়ায়ী গণহত্যা হয়েছে এমন প্রমাণিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় দেশের অভ্যন্তরে এবং অভিবাসনকালে ভিকটিমের শরীর ও মনে এমন ক্ষতিসাধন করা হয় যাকে আইনানুগভাবে গণহত্যা বলা যায়।

এ ক্ষেত্রে জাতিগত, গোষ্ঠীগত বা ধর্মগত নিধনের উদ্দেশে যদি একটি লোককেও হত্যা করা হয় সেটাও গণহত্যা। যদি কোনো জাতি, গোষ্ঠী বা বিশেষ ধর্মের মানুষের জন্ম রুদ্ধ করবার প্রয়াস নেওয়া হয় বা পরিকল্পিতভাবে বিশেষ জাতি ও গোষ্ঠীভুক্ত নারীর গর্ভে একটি ভিন্ন জাতির জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করা হয় সেটাও গণহত্যা। তবে শেষের বিষয়টিকে 'জেনোসাইডাল রেপ' বলা হয়। কেবল অর্থনৈতিক স্বার্থ বা রাজনৈতিক অভিসন্ধি নয়, বাঙালির প্রতি

ঘৃণা ও বিদ্বেষ ২৫শে মার্চ হত্যাকাণ্ডের পেছনে অন্যতম প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে। তাদের শীর্ষ ক্রোধ ছিল বাঙালি জাতিসত্তায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মী এবং প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের ওপর।

গণহত্যায় বিন্যাসকৃত মানুষের শ্রেণিবিন্যাসের সঙ্গে বধ্যভূমির সংখ্যা তার বিন্যাস এবং জেনোসাইডাল ম্যাপটি উপস্থাপন করলে দেখা যায় যে, ৫ হাজার বধ্যভূমিতে প্রায় ৯১১টি বধ্যভূমির তালিকাও রয়েছে। রয়েছে ৮৮টি নদী এবং ৬৫টি ব্রিজের তালিকা। যেখানে নিয়মিত হত্যা করা হতো নিরস্ত্র মানুষগুলোকে। নানা বধ্যভূমিতে নিহতদের একটি তালিকাও রয়েছে। এ সংক্রান্ত বিবরণসহ অপরাধের কেস হিস্ট্রি বিবৃত হয়েছে 'যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা বিচারের অন্বেষণ' শীর্ষক একটি গ্রন্থে এবং ইংরেজি ভাষায় রচিত Beyond Denial গ্রন্থে। সম্ভবত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শেষ গ্রন্থটি ব্যবহার করছেন ২৫শে মার্চকে জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির জন্য।

সময়োপযোগী পদক্ষেপের অভাবে ২৫শে মার্চকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয় সুদূর পরাহত বা প্রায় অসম্ভব বলে বিবেচিত হলেও শেষ পর্যন্ত বর্তমান সরকার এ পরিপ্রেক্ষিতে এই দাবি থেকে সরে আসেনি এবং ওই দিনকে International Day of Resistance against War and cruelty হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার দাবি জানান এবং সফল হন। এর ফলে বাংলাদেশের গণহত্যা বিশ্বের সামনে আসে। এছাড়া এই দিবসের পেছনে কিছু নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যেমন– ড. মুনতাসির মামুন ও শাহরিয়ার কবির। ১৯৭১-এর গণহত্যা জাদুঘর ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করেন ড. মুনতাসির মামুন। যা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম।

১৯৪৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত রেজ্যুলেশন ২৬০ (৩) এ অধীনে

সংজ্ঞা অনুসারে গণহত্যা কেবল হত্যাকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গণহত্যাকে এমন একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় যা বিশ্বময় প্রতিরোধে সকল রাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ। এই গণহত্যা বলতে বুঝায় এমন কর্মকাণ্ড যার মাধ্যমে একটি জাতি, ধর্মীয় সম্প্রদায় বা নৃতাত্ত্বিকগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে।

সংজ্ঞা অনুযায়ী গণহত্যা কেবল হত্যাকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ২৬০ (৩) এ অনুচ্ছেদ-২ এর অধীনে যে কর্মকাণ্ডকে আইনগতভাবে গণহত্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয় তা হলো–

(ক) পরিকল্পিতভাবে একটি জাতি বা গোষ্ঠীকে নির্মূল করার জন্য তাদের সদস্যদেরকে হত্যা বা নিশ্চিহ্নকরণ

(খ) তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিসাধন

(গ) পরিকল্পিতভাবে একটি জাতিকে ধ্বংস সাধনকল্পে এমন জীবননাশী অবস্থা সৃষ্টি করা যাতে তারা সম্পূর্ণ অথবা আংশিক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়

(ঘ) এমন কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যাতে একটি জাতি বা গোষ্ঠীর জীবন ধারণে শুধু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি নয়, সেই সাথে তাদের জন্ম প্রতিরোধ করে জীবনের চাকাকে থামিয়ে দেওয়া হয়।

(ঙ) একটি জাতি বা গোষ্ঠীর শিশু সদস্যদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে তাদের জন্মপরিচয় ও জাতিগত পরিচয়কে মুছে ফেলাকেও গণহত্যা বলা হয়।

২০১৭ সালের ১১ই মার্চ জাতীয় সংসদে ২৫শে মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস পালনের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার পর থেকেই দিনটি জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

স্বাধীনতার ৪৬ বছর পর, ২০১৭ সালের ২৫শে মার্চ দিনটিকে জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই বিষয়টি তুলে ধরেন। আর ১১ই মার্চ জাতীয় সংসদে সরকারের শরীক দল জাসদের শিরীন আখতারের উত্থাপিত এক প্রস্তাবে বলা হয়, 'সংসদের অভিমত এই যে, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাত্রিতে বর্বর পাকিস্তানি সেনাবহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যাকে স্মরণ করে ২৫শে মার্চকে গণহত্যা দিবস ঘোষণা করা

হোক। আন্তর্জাতিকভাবে এ দিবসের স্বীকৃতি আদায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হোক।'

তাই এই প্রস্তাব সংসদে গ্রহণ করা হয়। ২০১৫ সাল থেকে জাতিসংঘ ৯ই ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করেছে। বাংলাদেশ ২৫শে মার্চকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে চাইলেও তার সম্ভাবনা ক্ষীণ ছিল। তবুও বাংলাদেশ চেয়েছিল ২৫শে মার্চের কালরাত্রির গণহত্যাকে যেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোতে যতটা সম্ভব তথ্য-উপাত্ত পাঠানো হয়েছে। এর উদ্দেশ হলো মুক্তিযুদ্ধে যে সব দেশ, সে দেশগুলোর পার্লামেন্ট বা আইনসভায় ২৫শে মার্চের গণহত্যার স্বীকৃতি আদায় করা এবং তাদের সমর্থন পেলে অন্য দেশগুলোকে বিষয়টি বোঝানো সহজ হবে। একই সঙ্গে গণহত্যার সংজ্ঞা মেনে জাতিসংঘে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত এবং দলিল পাঠিয়েছে বাংলাদেশ। বিদেশে বাংলাদেশের সব দূতাবাসগুলোকে এ নিয়ে নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে। বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোতেও ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছে। পরবর্তীতে সবার ঐকান্তিক চেষ্টায় বাংলাদেশের ভয়াবহ কালরাত্রির ২৫শে মার্চকে ২০১৭ সালের ১১ই মার্চ জাতীয় সংসদে জাতীয় গণহত্যা দিবস পালনের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হলে দিনটি জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

কিন্তু কেন এই দিবসের প্রয়োজন হলো এটি বিশদভাবে জানতে গিয়ে জানলাম...

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে এক বিভীষিকাময় রাত নেমে আসে। মধ্যরাতে বর্বর পাকিস্তানি হানানদার বাহিনী কাপুরুষের মতো তাদের পূর্ব পরিকল্পিত অপারেশন সার্চ লাইটের নীলনকশা অনুযায়ী আন্দোলনরত বাঙালিদের কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার ঘৃণ্য লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অনেকেই মনে করেন, ২৫শে মার্চের গণহত্যা শুধু এক রাতের হত্যাকাণ্ডই ছিল না, এটা ছিল মূলত বিশ্ব সভ্যতার জন্য এক কলঙ্কজনক জঘন্যতম গণহত্যার সূচনা মাত্র।

ঘুমন্ত বাঙালির ওপর হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী নারকীয় এই হত্যাযজ্ঞ শুরু করে একাত্তরের পঁচিশে মার্চ রাতে। পাকিস্তানিদের এই গণহত্যা মোটেও আকস্মিক ছিল না, ছিল সুপরিকল্পিত। ২৫শে মার্চ বিকেলে ঘাতক ইয়াহিয়া ও জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা থেকে পালাবার পরই রাতে শুরু হয় তাদের 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামের গণহত্যা।

এই হত্যাযজ্ঞ একযোগে চলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, রাজারবাগ পুলিশ লাইনসহ ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন স্থানে।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ইপিআরের বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করে হামলা চালানো হয়। হত্যা করা হয় কয়েক হাজার পুলিশকে। তবে সেখানেই গড়ে ওঠে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ।

কালরাতে জঘন্যতম নৃশংসতা চালানো হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হলে। কয়েক হাজার শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে জগন্নাথ হলের মাঠে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি চালিয়ে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। নারী হলগুলোতে চলে অবর্ণনীয় নারকীয়তা।

মুটে মজুর রিকশাচালকও রেহাই পায়নি ঘাতকের সাঁজোয়া যান, মেশিনগানের গুলি থেকে। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে যখন এই নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চলছিল, তখন পাকিস্তানি বাহিনীর একটি দল চড়াও হয় ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর রোডে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে। গ্রেফতার করা হয় বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা ও সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আলোচনার আড়ালে পাকিস্তানিরা যে এমন ষড়যন্ত্র আঁটছে তা আঁচ করেই, 'অপারেশন সার্চ লাইট' শুরুর সাথে সাথেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেন রাজনীতি ও আন্দোলনের সিংহপুরুষ শেখ

মুজিবুর রহমান। যা ইপিআরের ওয়্যারলেস যোগে ছড়িয়ে দেওয়া হয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। গ্রেফতার করে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়া হয় অজ্ঞাতস্থানে।

একাত্তরের ২৫শে মার্চ কালরাতের সেই গণহত্যার বিপরীতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ঘটে। যা দীর্ঘ নয় মাসে নানা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার মধ্য দিয়ে আঁকা হয় নতুন এক মানচিত্র। যার নাম- বাংলাদেশ।

অস্ট্রেলিয়ার 'সিডনি মর্নিং হেরাল্ড' পত্রিকার ভাষ্য মতে শুধুমাত্র পঁচিশে মার্চ রাতেই বাংলাদেশে প্রায় এক লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল, যা গণহত্যার ইতিহাসে এক জঘন্যতম ভয়াবহ ঘটনা। পরবর্তী নয় মাসে একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যে ৩০ লাখ নিরপরাধ নারী-পুরুষ-শিশুকে হত্যার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ও তাদের দোসররা পূর্ণতা দিয়েছিল সেই বর্বর ইতিহাসকে।

সবার ঐকান্তিক চেষ্টায় বাংলাদেশের ভয়াবহ কালরাত্রির ২৫শে মার্চকে ২০১৭ সালের ১১ই মার্চ জাতীয় সংসদে জাতীয় গণহত্যা দিবস পালনের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হলে দিনটি জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

তাদের সংঘটিত গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ সবই ১৯৪৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত 'জেনোসাইড কনভেনশন' শীর্ষক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে বর্ণিত সংজ্ঞায় গণহত্যার চূড়ান্ত উদাহরণ। মার্কিন সাংবাদিক রবার্ট পেইন ২৫শে মার্চ রাত সম্পর্কে লিখেছেন, 'ঢাকায় ঘটনার শুরু মাত্র হয়েছিল। সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাড়িয়ে চলল মৃতের সংখ্যা। জ্বালাতে শুরু করল ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট লুট আর ধ্বংস তাদের নেশায় পরিণত হলো যেন। রাস্তায় রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতদেহগুলো কাক-শেয়ালের খাবারে পরিণত হলো। বাংলাদেশ হয়ে উঠল শকুন তাড়িত শ্মশান ভূমি।'

এই গণহত্যার স্বীকৃতি খোদ পাকিস্তান সরকার প্রকাশিত দলিলেও রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কট সম্পর্কে যে শ্বেতপত্র পাকিস্তানি সরকার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রকাশ করেছিল, তাতে বলা হয়: '১৯৭১ সালের পয়লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ রাত পর্যন্ত এক লাখেরও বেশি মানুষের জীবন নাশ হয়েছিল।'

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভ করা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের কাছে পাকিস্তানি জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের প্রক্রিয়া চলাকালে পাকিস্তানি সেনারা কুখ্যাত 'অপারেশন সার্চ লাইট' নাম দিয়ে নিরীহ বাঙালি বেসামরিক লোকজনের ওপর গণহত্যা শুরু করে। তাদের এ অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা-কর্মীসহ সকল সচেতন নাগরিককে নির্বিচারে হত্যা করা। ২৫শে মার্চ দুপুরের পর থেকেই ঢাকাসহ সারাদেশে থমথমে অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। এদিন সকাল থেকেই সেনা কর্মকর্তাদের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। হেলিকপ্টার যোগে তারা দেশের বিভিন্ন সেনানিবাস পরিদর্শন করে বিকেলের মধ্যে ঢাকা সেনানিবাসে ফিরে আসে।

ঢাকার ইপিআর সদর দফতর পিলখানাতে অবস্থানরত ২২তম বালুচ রেজিমেন্টকে পিলখানার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিতে দেখা যায়। এদিন মধ্যরাতে পিলখানা, রাজারবাগ, নীলক্ষেত আক্রমণ করে পাকিস্তানি সেনারা। হানাদারবাহিনী ট্যাংক ও মর্টারের মাধ্যমে নীলক্ষেতসহ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দখল করে নেয়। সেনাবাহিনীর মেশিনগানের গুলিতে, ট্যাংক-মর্টারের গোলায় ও আগুনের লেলিহান শিখায় নগরীর রাত হয়ে উঠে বিভীষিকাময়। পাকিস্তানি হায়েনাদের কাছ থেকে রক্ষা পায়নি রোকেয়া হলের ছাত্রীরাও। ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব ও জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য, ড. মনিরুজ্জামানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন

বিভাগের ৯ জন শিক্ষককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ঢাবির জগন্নাথ হলে চলে নৃশংসতম হত্যার সবচেয়ে বড়ো ঘটনাটি। এখানে হত্যাযজ্ঞ চলে রাত থেকে সকাল পর্যন্ত।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অপারেশন সার্চ লাইট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সকল পদক্ষেপ চূড়ান্ত করে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করে করাচি চলে যান। সেনা অভিযানের শুরুতেই হানাদারবাহিনী বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের আগে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং শেষ শত্রু বিদায় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার আহবান জানান।

বঙ্গবন্ধুর এই আহবানে সাড়া দিয়ে বাঙালিরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র লড়াই শেষে একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ণ বিজয় অর্জন করে। বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের।

চূড়ান্ত বিচারে ২৫শে মার্চের আঘাতটি ছিল মানুষের জীবনের ন্যায্য অধিকারের প্রতি, মানব মর্যাদার প্রতি, স্বাধীন সত্তা-সংশ্লিষ্ট চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার প্রতি। দেশে দেশে ঘটে যাওয়া সভ্যতা বিনাশী, মর্যাদা বিধ্বংসী এমন নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের জন্যই ২৫শে মার্চের মতো দিনগুলোকে স্মরণীয় করে রাখা প্রয়োজন। এটি স্মরণ করতে হবে এই কারণে যাতে এমন দিন আর কোথাও ফিরে না আসে। ২৫শে মার্চের কৃষ্ণ রাতে জমাট হয় যে আকাঙ্ক্ষা তা স্বাধীনতা সংগ্রামে অসামান্য শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এটাকে সামনে এনে আলোকোজ্জ্বল করতে হবে জাতির আত্মপরিচয় ও মূল্যবোধ। ■

তথ্য সূত্রঃ

১. বাংলা উইকিপিডিয়া
২. দৈনিক ভোরের কাগজ -২৯শে মার্চ ২০১৮
৩. দৈনিক প্রথম আলো- ২৫শে মার্চ ২০১৭
৪. গণহত্যা দিবসের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে- ড. এম এ হাসান

শ্রেণি-৯ম, সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা।

দেশে দেশে গণহত্যা

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

নিষ্ঠুরতার ইতিহাস বেশ পুরোনো। যুগে যুগে মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করতে যে সব কর্মকাণ্ড ঘটেছে তার মধ্যে গণহত্যা একটি বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে মানুষ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা, গুমের মতো নানাবিধ ঘৃণ্য কাজ করেছে কিছু মানুষরূপী দানব। যতটা না যৌক্তিক কারণ তার বেশি ক্ষমতা দখল ও লোভের কারণে এই হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে।

দুইয়ের অধিক বা অনেক মানুষ মেরে ফেলাই হচ্ছে গণহত্যা। এছাড়া কোনো দেশ, জাতি, গোষ্ঠী বা ভিন্ন মতাদর্শধারীদের খুন এবং মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করাই হলো গণহত্যা। ১৯৪৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত রেজ্যুলেশন ২৬০ (৩) এর অধীনে গণহত্যা বলতে একটি জাতি বা ধর্মীয় সম্প্রদায় বা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস বুঝায়। পৃথিবীর অনেক দেশেই গণহত্যার অসংখ্য ইতিহাস রয়েছে।

পাকিস্তানি বাহিনীর বাংলাদেশে গণহত্যা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ২৫শে মার্চ একটি কলঙ্কিত দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের মানুষের উপর নেমে আসে ভয়ঙ্কর এক অভিশাপ। বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এই রাতে অপারেশন সার্চ লাইট এর নামে ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালির উপর আধুনিক মরণাস্ত্র নিয়ে হিংস্রের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাক বাহিনীর এ হামলার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে শুরুতেই ধ্বংস করে দেওয়া। সেই রাতে হানাদার বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, ইকবাল হল, রোকেয়া হল, শিক্ষকদের বাসা, পিলখানা ইপিআর সদর দফতর, রাজারবাগ পুলিশ লাইনে একযোগে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে হত্যা করে অগণিত নিরস্ত্র

পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত ঢাকা, ২৬শে মার্চ ১৯৭১

মানুষকে। সেই রাতে একে একে দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, জাতীয় প্রেসক্লাবে অগ্নিসংযোগ, মর্টার শেল ছুড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে পাক হানাদাররা।

২৫শে মার্চ নিরীহ বাঙালির উপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় ঢাকা। ২৫শে মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের মানুষের উপর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিল। বিশ্বের আরো অনেক দেশে গণহত্যার ইতিহাস আছে।

এই হামলায় গণমাধ্যমকর্মী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ জন শিক্ষককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে সরারাত ধরে চলে নৃশংসতম হত্যার সবচেয়ে বড়ো ঘটনাটি। ২৫শে মার্চের রাত সম্পর্কে মার্কিন সাংবাদিক রবার্ট পেইন লিখেছেন। সে রাতে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে সৈন্যরা বাঙালি মারার সাথে সাথে জালাতে শুরু করল ঘরবাড়ি, দোকানপাট লুট আর ধ্বংস যেন তাদের নেশায় পরিণত হয়।

বসনীয় গণহত্যা

১৯৯২ সালের এপ্রিলে যুগোস্লাভিয়া থেকে নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করার অপরাধে মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায় বসনীয় সার্বরা। ধারণা করা হয় এই গণহত্যায় কমপক্ষে ১ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। তিন বছর ধরে চলা এই গণহত্যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নৃশংসতার শিকার হয়েছে সেব্রেনিৎসায় বসবাসরত নারী ও শিশু-কিশোররা।

আর্মেনীয় গণহত্যা

ইউরোপের একটি দেশ আর্মেনিয়া। দেশটি ১৯১১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯২২ সালে এটি সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুর্কিরা আর্মেনীয়দের উপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। তিন বছর স্থায়ী এই গণহত্যায় ৩৪ লাখ আর্মেনীয়নদের মধ্যে ১৫ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়।

হলোকাস্ট ও ন্যানকিং গণহত্যা

হলোকাস্ট শব্দের অর্থ সবকিছু পোড়ানো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান বাহিনী কর্তৃক ৬০ লাখ ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের হত্যা করা হয়। এটিই স্মরণকালের সবচেয়ে নৃশংসতম গণহত্যা। জার্মান বাহিনী ১৯৪১ সাল নাগাদ বেশকিছু দেশ দখলে নেয়। এই বাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে পার্শ্ববর্তী পোল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ডেনমার্ক ও নরওয়েতে লাখ লাখ মানুষ আশ্রয় নেয়। অনেক ইহুদিকে বন্দি করে পাঠানো হয় পোল্যান্ড ও জার্মানির বন্দিশালাগুলোতে। এসব বন্দিশালাতেই কখনো গুলি, কখনো গ্যাস কিংবা কখনো রাসায়নিক প্রয়োগে হত্যা করা হয় কয়েক লাখ ইহুদিকে। বন্দিশালায় অত্যাধিক পরিশ্রম, খাবারের অভাব আর চিকিৎসার অভাবেও মারা যায় বহু ইহুদি। ■

২৫শে মার্চ। রাত ১১টা বেজে ৪২ মিনিট।

আমার খুব ভয় করছে আপু! আমার খুব ভয় করছে।

ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। আমার পাশে বসে আছে আমার ছোটো বোনটা। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে! ঠান্ডা হাতটা দিয়ে আমার একটা হাত ধরে রেখেছে।

কী হয়েছে তোর? দুঃস্বপ্ন দেখেছিস? ভয় পাস না। আমি আছি তো। পাশের ঘরে বাবা-মা আছে...

কথা শেষ করতে পারি না আমি। দরজায় দমাদম ধাক্কা দিচ্ছে কারা যেন! দরজার ওপাশে পর পর অনেকগুলো গুলির আওয়াজ। আমি ছুটে যাই দরজার দিকে।

কালরাত্রি

ফারজানা তান্নী

খুলিস না আপু। ওরা সবাইকে মেরে ফেলবে।

আমি ফিরে আসি। আমার বোনটাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বসে থাকি। কী হচ্ছে এসব!

দমাদম লাথি পড়ছে আমাদের দরজায়। ভেঙেই ফেলবে যেন। বোনটাকে খাটের নিচে লুকিয়ে থাকতে বলে আমি এগিয়ে যাই দরজার দিকে। দরজা পর্যন্ত যাওয়ার আগেই ওরা দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে।

চারজন খাকি পোশাকের পাকিস্তানি সেনা। স্বশস্ত্র। সাথে লুঙ্গি পরা আমাদের পাড়ার মতি চাচা। টেনেহিঁচড়ে আমাকে বাইরে নিয়ে যায় ওরা। ঘরের ভেতর আর চেক করল না। মনে মনে স্বস্তি পাই, বোনটা তো বেঁচে গেল!

বাইরে এসে দেখি খাকি পোশাকের দু'জন বাবা-মা'র দিকে বন্দুক তাক করে রেখেছে। আমাদের তিনজনকেই টেনেহিঁচড়ে বাড়ির উঠোনে নিয়ে আসা হলো। বন্দুক তাক করা।

পাকসেনাদের লিডার বলে উঠল, 'সবকো মার দো!'

কিছুই করার নেই ভেবে আমি চোখ বন্ধ করি। কয়েক সেকেন্ডকে যেন মনে হয় কয়েক যুগ! হঠাৎ একটা কথায় আমি চোখ খুলতে বাধ্য হই। আমার ছোটো বোনটা বাইরে বেরিয়ে আসে। চিৎকার করে বলে, 'আমাকে মারো! ওদেরকে ছেড়ে দাও!'

কী বোকা আমার বোনটা! কী হবে এখন!

ওকে দেখে হঠাৎই ভীষণ ক্ষেপে যায় পাকসেনাদের লিডার। কিছু না বলে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় আমার ছোটো বোনটাকে!

আমি এই দৃশ্য সহ্য করতে পারি না। জ্ঞান হারাই। চোখ খুলে আমি নিজেকে আবিষ্কার করি উঠোনে। আশপাশে কেউ নেই। নেই কোলাহল, নেই গুলির আওয়াজ। ভোর হয়ে এসেছে। আমি ধীর পায়ে এগিয়ে যাই ঘরের ভেতরে। বাবা-মায়ের ঘরে যাই। ওরা তো ঘুমুচ্ছে! সারা বাড়িতে কোনো ধ্বংসের নিশানা নেই। সব ঠিকঠাক। আমি ঠান্ডা এক গ্লাস পানি খাই। এখনো ভয়ে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে চলেছে। কী হচ্ছিল ঐ সব! কাঁপা পায়ে নিজের ঘরের দিকে এগোই। বোনটা ঠিক আছে তো! লাইট জ্বালাই। খাটের নিচে চেক করি। কই কেউ তো নেই!

ঠিক এই সময় আমার মনে পড়ে, আমার তো কোনো ছোটো বোনই নেই! তাহলে কাল রাতে আমার ঘরে এসেছিল ও কে! আমি স্তব্ধ!

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত্রিতে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া একটা ১৫/১৬ বছরের মেয়ে আমার কাছে এসেছিল একটু নিরাপত্তার আশায়। শেষে চরম সাহসিকতায় নিজের জীবন বাজি রেখে আমাদের পুরো পরিবারকে বাঁচাতে চেয়েছিল পাকসেনাদের কবল থেকে। ২৫শে মার্চের সেই কালরাত্রিতে কী সে তার পরিবারকে বাঁচাতে পেরেছিল! নাকি তার এবং তার পরিবারের জন্য অপেক্ষা করেছিল আরো ভয়াবহ পরিণতি!

আজ ২৫শে মার্চ, ২০১৯। আমার চোখ ফেটে আসে কান্নায়। ■

একজন মুক্তিযোদ্ধাকে দেখা

তাসিন মোহাম্মদ

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি
মুক্তিযোদ্ধাকে দেখেছি।
আমি সাতচল্লিশ-বাহান্ন-একাত্তর দেখিনি
একাত্তর বছরের যোদ্ধাকে দেখেছি।
সে ছিল পলাশ ডাঙার
বীর সাহসী যোদ্ধা।
সে ছিল আমার পড়শি বন্ধু
গল্প বলার সাথি।
সে ছিল আমার খেলার সখা
চাঁদ দেখানোর বাতি।
তাঁর ঝুলিতে ছিল অ-নে-ক
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি
ক'মাস আগে ঘটে গেছে
তাঁর জীবনের ইতি।
সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা ভরে
ডাকতো 'অরুন বাবু'।
মা ডাকতেন 'অরুন কাকু'
আমি ডাকতাম 'দাদু'।

স্বাধীনতা দিবস দেশে দেশে

শাহানা আফরোজ

পৃথিবী নামের গ্রহে বাস করে অসংখ্য মানুষ । তাদের রয়েছে ভাষার ভিন্নতা, জাতিগত পার্থক্য সাংস্কৃতিক দিক থেকেও অমিল। কখনোবা তাদের মধ্যে থাকে দ্বি-মত। কেউ চায় শোষণ করতে , কেউবা শোষিত হতে চায় না । প্রতিবাদ করে । এভাবেই শুরু হয় দ্বন্দ্ব। যুদ্ধ বাঁধে, যুদ্ধে এক দেশ বা জাতি হয় জয়ী অন্যজন পরাজিত। এভাবে ভাগ হতে হতে পৃথিবীতে অসংখ্য রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশই নিজেদের ওপর অন্যায় অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। বন্ধুরা এসো জেনে নেই যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে এমন কিছু দেশের নাম।

বাংলাদেশ: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি রাষ্ট্র। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সমাপ্তির পর ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশের সৃষ্টি হয়। একটি পশ্চিম পাকিস্তান এবং অপরটি পূর্ব পাকিস্তান। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের শোষণ, নিপীড়নের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মাঝে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হতে থাকে। সারা বাংলাদেশের মানুষসহ মুক্তিযোদ্ধারা দীর্ঘ ৯ মাস অবিরাম যুদ্ধ করে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান বাহিনীকে পরাভূত করে।এর মধ্যদিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। তাই ২৬শে মার্চকে স্বাধীনতা দিবস এবং ১৬ই ডিসেম্বরকে বিজয় দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয় বাংলাদেশে।

পাকিস্তান: পাকিস্তান ভারতীয় উপমহাদেশের একটি অংশ।পাকিস্তান এলাকাটি ১৫২৬ থেকে ১৮শ শতক পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। ব্রিটিশ শাসনের অধীন থেকে যুদ্ধ করে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীনতা লাভ করে।

ভারত : ১৮৫৬ সালের মধ্যেই ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়।। এর এক বছর পরেই ঘটে ভারতীয় সিপাহি ও দেশীয় রাজ্যগুলোর সম্মিলিত এক জাতীয় গণ-অভ্যুত্থান। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত ব্রিটিশ শাসনজাল থেকে মুক্ত হয়।

তাসনোভা আলম (লিশান)
সপ্তম শ্রেণি মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

শ্রীলংকা: দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপ শ্রীলংকা ১৯৭২ সালের আগে সিলন নামে পরিচিত ছিল। ১৭৯৬ সালে দ্বীপটি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে চলে যায়। ১৯৩০ সালের দিকে স্থানীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের নির্যাতন-অত্যাচারের জন্য স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয়।১৯৪৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সিলন নামে দেশটি স্বাধীনতা পায় যুক্তরাজ্যের কাছ।

জাপান: বিশ্বের বুকে একটি প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি জাপান। ৬৬০ খ্রিষ্টপূর্বের ১১ই ফেব্রুয়ারি জাপান জাতির প্রতিষ্ঠা হয়। তাই এ দিনটিকে তারা জাতীয় প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর ১৯৪৫ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা সাময়িকভাবে জাপান দখল করে।পরবর্তীতে জাপান স্বাধীনতা লাভ করলেও স্বাধীনতা দিবস পালন হয় ১১ই ফেব্রুয়ারি।

ইন্দোনেশিয়া: প্রায় ৫০০০ দ্বীপ আছে ইন্দোনেশিয়ায়। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিন বছর জাপানিরা ইন্দোনেশিয়া দখল করে রাখে। দেশটি তখন নেদারল্যান্ডের অধীনে ছিল। ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগস্ট জাপানের আত্মসমর্পণের তিন দিন পর ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া : কোরিয়া মূলত জাপানিদের দখলে ছিল। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আদর্শগত কারণে অবিভক্ত কোরিয়া ২ ভাগে ভাগ হয়ে যায়।১৯৪৮ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর উত্তর কোরিয়া এবং ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট দক্ষিণ কোরিয়ার স্বাধীনতা দিবস।

ফ্র্যান্স: বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো জাতি-রাষ্ট্রের মধ্যে একটি হলো ফ্র্যান্স। রোমান সাম্রাজ্যের পতন হওয়ার আগ পর্যন্ত অনেকগুলো রাজবংশ ধারাবাহিকভাবে ফ্রান্স শাসন করে। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবে রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। ১৯৫৮ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর নতুন ফ্রান্সের যাত্রা শুরু হয়।

মিশর: নীল নদের দেশ মিশর প্রায় ৩২০০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকেই একটি সংহত রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিদ্যমান। ১৮৮২ সালে ব্রিটিশ সেনারা মিশর দখল করার পর প্রায় ৪০ বছর এ ভূখণ্ডে তাদের উপনিবেশ ছিল। ১৯৫২ সালের ২৩শে জুলাই প্রজাতন্ত্র হিসেবে মিশর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে কারণেই ২৩ জুলাইকে মিশরের জাতীয় দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। মিশরকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয় ১৯৫৩ সালের ১৮ই জুন।

ব্রাজিল: ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে পূর্ণ ব্রাজিল ১৫০০ থেকে ১৮২২ সাল পর্যন্ত একটি পর্তুগিজ উপনিবেশ ছিল। ১৮২২ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর দেশটি স্বাধীনতা অর্জন করে

বেলারুস: ১৯৯১ সালের ২৭শে জুলাই বেলারুশের আইনসভা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে দেশটির সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে এবং ২৫শে আগস্ট স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

সাইপ্রাস: ১৯৬০ সালের ১৬ই আগস্ট যুক্তরাজ্যের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু ১লা অক্টোবরকে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে উদযাপন করা হয়।

বেলজিয়াম: ১৮৩০ সালের ৪ঠা অক্টোবর স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। আর স্বীকৃতি পায় ১৮৩৯ সালের ১৯শে এপ্রিল।

ইন্দোনেশিয়া: ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগস্ট নেদারল্যান্ড থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু তা স্বীকৃতি পায় ১৯৪৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর।

ম্যাক্সিকো: স্পেন থেকে স্বাধীন হয় ১৮১০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর। কিন্তু স্বাধীন দেশ হিসেবে পরিচিতি পায় ১৮২১ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর।

ফিলিপাইন: ১৮৯৮ সালের ১২ জুন স্পেন থেকে স্বাধীন হয়। ১৯৪৬ সালের ৪ঠা জুলাই যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বাধীনতার অনুমোদন দেয়া হয়। এ দিনটি ফিলিপাইনি আমেরিকান বন্ধুত্বের দিন হিসেবে পরিচিত।

ভ্যাটিকান সিটি: ১৯২৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি ইতালির সাথে লাতেরান চুক্তির অধীনে ভ্যাটিকান সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম এই রাষ্ট্রটি রোম শহরের ভেতরে অবস্থিত স্বাধীন রাষ্ট্র।

সুইজারল্যান্ড: ১২৯১ সালের ১লা আগস্ট রোমান সাম্রাজ্যের বিপরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ফেডারেল স্টেট হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায় ১৮৪৮ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর।

পৃথিবীর সকল জাতি বা রাষ্ট্রই স্বাধীনতা চায় আর তাই স্বাধীনতা দিবস সবার কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। এসো জেনে নেয়া যাক কিছু দেশের স্বাধীনতা দিবস এবং যে দেশ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে সেসব দেশের নাম।

দেশের নাম	স্বাধীনতার দিবস	যে দেশ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছে
আলজেরিয়া	৫ই জুলাই, ১৯৬২	ফ্রান্স
অ্যান্ডোরা	১৪ই মার্চ, ১৯৯৩	ফ্রান্স এবং স্পেন
অ্যাঙ্গোলা	১১ই নভেম্বর, ১৯৭৫	পর্তুগাল
অ্যান্টিগুয়া ও বারবুদা	১লা নভেম্বর, ১৯৮১	যুক্তরাজ্য
আর্জেন্টিনা	৯ই জুলাই, ১৮১৬	স্পেন
আর্মেনিয়া	২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯১	সোভিয়েত ইউনিয়ন
অস্ট্রিয়া	১৫ই মে, ১৯৫৫	যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্য
বাহামা	১০ই জুলাই, ১৯৭৩	যুক্তরাজ্য
বাহরাইন	১৫ই আগস্ট, ১৯৭১	যুক্তরাজ্য
বারবাদোস	৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৬	যুক্তরাজ্য
বেলিজ	২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮১	যুক্তরাজ্য
বেনিন	১লা আগস্ট, ১৯৬০	ফ্রান্স
বলিভিয়া	৬ই আগস্ট, ১৮২৫	স্পেন
বোতসোয়ানা	৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬	যুক্তরাজ্য
ব্রাজিল	৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮২২	পর্তুগাল
ব্রুনাই	১ জানুয়ারি, ১৯৮৪	যুক্তরাজ্য
বুলগেরিয়া	২২ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮	অটোমান সম্রাজ্য
বুরুন্ডি	১লা জুলাই, ১৯৬২	বেলজিয়াম
চাদ	১১ই আগস্ট, ১৯৬০	ফ্রান্স
গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো	৩০শে জুন, ১৯৬০	ফ্রান্স
কোষ্টারিকা	১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮২১	স্পেন
ক্রোয়েশিয়া	৮ই অক্টোবর, ১৯৯১	ইউগোস্লাভিয়া
ডোমেনিকান প্রজাতন্ত্র	২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৪	হাইতি
পশ্চিম তিমুর	২০শে মে, ২০০২	ইন্দোনেশিয়া
ইকুয়েডর	২৪শে মে, ১৮২২	স্পেন
আল সালভাদোর	১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮২১	স্পেন
ফিনল্যান্ড	৬ই ডিসেম্বর, ১৯১৭	রাশিয়া
গাম্বিয়া	১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮	যুক্তরাজ্য
জর্জিয়া	২৬শে মে, ১৯১৮	রাশিয়া
ঘানা	৬ই মার্চ, ১৯৫৭	যুক্তরাজ্য

দেশের নাম	স্বাধীনতার দিবস	যে দেশ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছে
গ্রিস	২৫শে মার্চ, ১৮২১	অটোমান সাম্রাজ্য
গুয়াতেমালা	১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮২১	স্পেন
গায়ানা	২৬শে মার্চ, ১৯৬৬	যুক্তরাজ্য
হাইতি	১লা জানুয়ারি, ১৮০৪	ফ্রান্স
হুন্ডুরাস	১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮২১	স্পেন
আইসল্যান্ড	১৭ই জুন, ১৯৪৪	ডেনমার্ক
জ্যামাইকা	৬ই আগস্ট, ১৯৬২	যুক্তরাজ্য
জর্ডান	২৫শে মে, ১৯৪৬	যুক্তরাজ্য
কাজাকিস্তান	১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯১	সোভিয়েত ইউনিয়ন
কেনিয়া	১২ই ডিসেম্বর, ১৯৬৩	যুক্তরাজ্য
কুয়েত	২৬শে জানুয়ারি, ১৯৬১	যুক্তরাজ্য
কিরগিজিস্তান	৩১শে আগস্ট, ১৯৯১	সোভিয়েত ইউনিয়ন
লাতভিয়া	১৮ই নভেম্বর, ১৯১৮	রাশিয়া
লাইবেরিয়া	২৬শে জুলাই, ১৮৪৭	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
মাদাগাস্কার	২৬শে জুন, ১৯৯০	ফ্র্যান্স
মালদ্বীপ	২৬শে জুলাই, ১৯৬৫	যুক্তরাজ্য
মাল্টা	২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪	যুক্তরাজ্য
মরিশাস	১২ই মার্চ, ১৯৬৮	যুক্তরাজ্যের
মালডোভা	২৭শে আগস্ট, ১৯৯১	সোভিয়েত ইউনিয়ন
মঙ্গোলিয়া	১১ই জুলাই, ১৯২১	চীন
মরক্কো	২রা মার্চ, ১৯৫৬	স্পেন এবং ফ্রান্স
মায়ানমার	৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৪৮	যুক্তরাজ্য
নাইজেরিয়া	১লা অক্টোবর, ১৯৬০	যুক্তরাজ্য
নরওয়ে	১৭ই মে, ১৯০৫	সুইডেন
পানামা	২৮শে নভেম্বর, ১৮২১	স্পেন
পাপুয়া নিউ গিনি	১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫	অস্ট্রেলিয়া
প্যারাগুয়ে	১৫ই মে, ১৮১১	স্পেন
পেরু	২৮শে জুলাই, ১৮২১	স্পেন
পোল্যান্ড	১১ই নভেম্বর, ১৯১৮	রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার
পর্তুগাল	১লা ডিসেম্বর, ১৬৪০	স্পেন

দেশের নাম	স্বাধীনতার দিবস	যে দেশ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছে
কাতার	৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	যুক্তরাজ্য
আয়ারল্যান্ড	৬ই ডিসেম্বর, ১৯২২	যুক্তরাজ্য
রুয়ান্ডা	১লা জুলাই, ১৯৬২	বেলজিয়াম
সারবিয়া	১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮০৪	অটোমান সাম্রাজ্য
সিয়েরা লিওন	২৭শে এপ্রিল, ১৯৬১	যুক্তরাজ্য
সিঙ্গাপুর	৯ই আগস্ট, ১৯৬৫	মালয়েশিয়া
দক্ষিণ আফ্রিকা	১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩১	যুক্তরাজ্য
সোয়াজিল্যান্ড	৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮	যুক্তরাজ্য
তাজিকিস্তান	৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯১	সোভিয়েত ইউনিয়ন
তানজানিয়া	৯ই ডিসেম্বর, ১৯৬১	যুক্তরাজ্য
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো	৩১শে আগস্ট, ১৯৬২	যুক্তরাজ্য
তিউনেশিয়া	২০শে মার্চ, ১৯৫৬	ফ্রান্স
ইউক্রেইন	২৪শে আগস্ট, ১৯৯১	সোভিয়েত ইউনিয়ন
সংযুক্ত আবর আমিরাত	২রা ডিসেম্বর, ১৯৭১	যুক্তরাজ্য
যুক্তরাষ্ট্র	৪ঠা জুলাই, ১৭৭৬	কিংডম অব গ্রেট ব্রিটেন
উরুগুয়ে	২৫শে আগস্ট, ১৮২৫	ব্রাজিল
উজবেকিস্তান	১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯১	সোভিয়েত ইউনিয়ন
ভেনিজয়েলা	৫ই জুলাই, ১৯৪৫	স্পেন
ভিয়েতনাম	২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫	ফ্র্যান্স
ইয়েমেন	৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৭	যুক্তরাজ্য
জিম্বাবুয়ে	১৮ই এপ্রিল, ১৯৮০	যুক্তরাজ্য

দুটি স্বাধীনতা দিবস যে-সব দেশে

বাংলাদেশে বিজয় দিবস এবং স্বাধীনতা দিবস আছে। কিন্তু পৃথিবীতে অনেক দেশই আছে যাদের দুটো করে স্বাধীনতা দিবস। চলো জেনে নেয় যাক এমন কিছু অদ্ভুদ দেশের নাম।

লাটভিয়া : ১৮ই নভেম্বর, ১৯১৮; রুশ সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। ৪ঠা মে, ১৯৯০; সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গরূপে স্বাধীন হয় লাটভিয়া। দুটো দিনই সে দেশে স্বাধীনতা দিবসের মর্যাদায় পালন করা হয়।

পানামা : ২৮শে নভেম্বর, ১৮২১; স্পেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ৩রা নভেম্বর, ১৯০৩; কলাম্বিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পানামা আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পানামায় ২৮শে নভেম্বর স্বাধীনতা দিবস আর ৩রা নভেম্বর 'সেপারেশন ডে' হিসেবে পালন করা হয়।

ইকুয়েডর: ১০ই আগস্ট, ১৮০৯; স্পেনের কাছ থেকে প্রথমবারের মতো স্বাধীনতা অর্জন করে ইকুয়েডর। এই স্বাধীনতা অবশ্য ২৪ দিনের মধ্যেই হাতছাড়া হয়ে যায়। ২৪শে মে, ১৮২২; পিচিনচা (Pichincha)

যুদ্ধের মাধ্যমে পুরোপুরি স্বাধীনতা অর্জন করে। প্রথম দিনটিই ইকুয়েডরে প্রকৃত স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। আর ২৪শে মে দিনটিতে পিচিনচা যুদ্ধের দিন হিসেবে পালন করা হয়

চিলি: ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮১০; প্রথম সরকার গঠিত হওয়া উপলক্ষে তারা এই দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করে। ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৮১৮; স্পেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। এ দিনটি অবশ্য চিলিতে সরকারি ছুটির দিন নয়।

কলম্বিয়া : ২০শে জুলাই, ১৮১০; স্পেনের শাসন থেকে কলম্বিয়াকে স্বাধীন ঘোষণা করা হয়। ৭ই আগস্ট, ১৮১৯; বোয়াসার যুদ্ধে জয়ী হয়ে স্পেনের কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা অর্জন করে। প্রথম দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হয়, আর ৭ই আগস্ট ঐ যুদ্ধের বর্ষপূর্তি পালিত হয়।

জর্জিয়া: ২৬শে মে, ১৯১৮; গণপ্রজাতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ঘোষিত হয়। ৯ এপ্রিল, ১৯৯১; সোভিয়েত ইউনিয়ন বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। ২৬ মে জর্জিয়ার স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হয় আর ৯ই এপ্রিল 'ইউনিটি ডে'।

লিথুনিয়া : ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮; রুশ এবং জার্মান সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। ১১ই মার্চ, ১৯৯০ সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। লিথুনিয়াতেও দুই দিনই স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

চেক রিপাবলিক: ২৮শে অক্টোবর, ১৯১৮; চেকোস্লোভাকিয়া হিসেবে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। ১লা জানুয়ারি, ১৯৯৩; চেকোস্লোভাকিয়া থেকে স্লোভাকিয়া আলাদা হয়ে যায় এবং চেক রিপাবলিক ও স্লোভাকিয়া নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। দুটো দিনকেই চেক রিপাবলিকে ঘটা করে পালন করা হয়। ২৮শে অক্টোবর চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা পাবার দিন এবং ১লা জানুয়ারি হচ্ছে স্বাধীন চেক প্রজাতন্ত্রের পুনরায় প্রতিষ্ঠার দিন।

আযারবাইজান: ২৮শে মে, ১৯১৮; রুশ সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। এ দিনটি সে দেশে 'রিপাবলিক ডে' হিসেবে পালিত হয়। ১৮ই অক্টোবর, ১৯৯১; সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা লাভ করে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য অনেক দেশের মতো আযারবাইজানেও দুটো দিনই স্বাধীনতা দিবসের মর্যাদায় পালিত হয়।

ইউক্রেন : ২২শে জানুয়ারি, ১৯১৯; ইউক্রেন প্রজাতন্ত্র এবং পশ্চিম ইউক্রেন প্রজাতন্ত্র মিলে সমন্বিত রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়। এ দিনটি ইউক্রেনের 'ইউনিটি ডে' হিসেবে পালন করা হয়। ২৪শে আগস্ট, ১৯৯১; সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আলাদা হয়ে ইউক্রেন স্বাধীনতা লাভ করে। এ দিনটি ইউক্রেনে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হয়। ■

আফিয়া ইবনাত অর্থী, তৃতীয় শ্রেণি, বিজ্ঞান স্কুল, রাজশাহী

গল্প নয় সত্যি

মিশন করাচি

সিরু বাঙালি

করাচি বিমানবন্দরে গ্রেফতারকৃত বঙ্গবন্ধু

পাকিস্তানের করাচি বিমানবন্দর। দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ। সন্ধ্যা ৭টার সময় পি আই-এর একটি ৭০৭ বোয়িং বিমান রানওয়ে স্পর্শ করে। দ্রুত দৌড় শেষ করে ভি আই পি লাউঞ্জ বরাবর টারমাকে এসে দাঁড়ায় বিমানটি।

বিমানের দিকে গ্যাঙওয়ে এগিয়ে যাবার আগেই দেখা গেল একদল এয়ারফোর্স সিকিউরিটি পুরো বিমানটি ঘেরাও করে ফেলে। পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ চলছে। তার ছোঁয়া পশ্চিম পাকিস্তানেও লেগেছে। তাই এই সিকিউরিটি কর্ডনকে কেউ আমলে নিল না। কিন্তু বোরহান খান নামে সিভিল এভিয়েশনের এক সিকিউরিটি অফিসার খুব গুরুত্বসহকারে ব্যাপারটি বিবেচনায় নিলেন।

বোরহান জানেন, ভিআইপি লাউঞ্জে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা আসেন। তাই সিভিল এভিয়েশন নিরাপত্তা কর্মীরা এখানে কঠোর নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন। দেশের প্রেসিডেন্ট ছাড়া আর কারো জন্য স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স নিয়োজিত হয় না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৫শে মার্চ রাতেই ঢাকা থেকে করাচি পৌঁছেছেন। সুতরাং প্রেসিডেন্ট নয়। তাহলে কে? কার জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা?

৭০৭ বোয়িং-এর দরজা খুলে যাবার সাথে সাথেই বোরহান লক্ষ করলেন, টারমাক বরাবর যে দুটি ফ্লাশ লাইট আলো দিত, হুট করে তা নিভে গেল। অবাক হয়ে গেলেন বোরহান। অন্য সব লাইট জ্বলছে। শুধু ভিআইপি লাউঞ্জের দরজা থেকে বিমানের গ্যাঙওয়ে পর্যন্ত সরু পথটা অন্ধকারে ঢেকে গেল।

দশ মিনিট পরেই বোরহানের মোহভঙ্গ হলো। তিনি দেখলেন, চারজন এয়ারফোর্স সৈন্য লম্বা সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এক লোককে কর্ডন করে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসছেন।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন বোরহান। দেখলেন, ভিআইপি লাউঞ্জের সোফায় বসে রয়েছেন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এতক্ষণে বোরহান বুঝতে পারলেন, এত আয়োজন, এত রাখঢাক এই মানুষটির জন্য।

বোরহান খান জানেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে। এই লোকের নির্দেশে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি জীবন দিতে পারে। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬৯টি আসন পেয়ে এই লোক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ তিনি বন্দি। ২৫শে মার্চ বিকেলে বঙ্গবন্ধুকে বন্দি ও বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার হুকুম দিয়ে ইয়াহিয়া খান করাচি চলে এসেছিলেন। এ সবই বোরহান খানের জানা কথা।

আধা ঘণ্টা পর বোরহান খানের সুযোগ এসেছে বঙ্গবন্ধুর কাছাকাছি যাবার। করাচি বিমানবন্দরে সিভিল এভিয়েশনের সিকিউরিটি ইনচার্জ তিনি। সুতরাং যত্রতত্র যাবার অধিকার তাঁর। বঙ্গবন্ধুকে সন্ধ্যাকালীন নাশতা দেবার দায়িত্বটি তিনি নিজেই বহন করলেন। এয়ারফোর্স সৈন্যরা গেইট বরাবর দাঁড়ানো। এই সুযোগে বোরহান খান নাশতা দেবার ফাঁকে বঙ্গবন্ধুকে সালাম দিলেন। পরিষ্কার বাংলায় বললেন। স্যার, আমার নাম বোরহান খান। ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলিতে আমাদের আদি নিবাস। ১৯৪৭ সালের দাঙার সময় পূর্ববাংলায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। চট্টগ্রামের ফিরোজ শাহ কলোনিতে বড়ো হয়েছি। সেখানেই সীতাকুণ্ডের এক মেয়েকে বিয়ে করে সংসারি হয়েছি। সিভিল এভিয়েশনে চাকুরির সুবাধে করাচি এয়ারপোর্টে পোস্টিং। আপনার যদি কোনো বার্তা থাকে তাহলে আমাকে নির্ভয়ে দিতে পারেন, স্যার।

বঙ্গবন্ধু অনেকক্ষণ বোরহানের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর আস্তে করে বললেন, কিছুক্ষণের মধ্যে আমাকে লয়ালপুর কারাগারে নিয়ে যাওয়া হবে। এই খবরটা করাচি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার এনায়েত করিমকে পৌঁছাবে। খুব জরুরি। সাবধানে থাকবে।

এর ঠিক বিশ মিনিট পর এয়ারফোর্সের একটি হেলিকপ্টার রওয়ানা হলো লয়ালপুরের দিকে। বঙ্গবন্ধুকে এবার এসকর্ট করে নিয়ে গেলেন মেজর র‍্যাংকের দু'জন সেনা কর্মকর্তা।

২.

রাতে খেতে বসে বোরহান উদ্দিন খান স্ত্রীর সামনে বঙ্গবন্ধুর বিষয়টা তুললেন। পারিবারিকভাবে বোরহান খানের ভাষা উর্দু হলেও বাঙালি স্ত্রীর সাথে তিনি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষাতেই কথা বলেন। কিন্তু আজ তিনি খাবার টেবিলে শুদ্ধ বাংলাতেই কথা শুরু করলেন। এর কারণও আছে। খাবার টেবিলে এখন তাদের সাথে ছেলে কামরান খানও রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পুরো ব্যাপারটি শুনে বোরহানের স্ত্রী রাবেয়া সুলতানা খুবই মর্মাহত হলেন। বঙ্গবন্ধু তার স্বপ্নের মহাপুরুষ। পাকিস্তানিরা তাঁকে বন্দি করে নিয়ে আসা মানে তাঁর জীবন এখন বিপন্ন। অন্যদিকে তাঁর অনুপস্থিতিতে বাঙালি জাতির কী অবস্থা হবে সেটা নিয়েও তিনি শঙ্কিত।

বোরহানের মত কিন্তু ভিন্ন। তিনি বললেন, বঙ্গবন্ধুকে পকিস্তানে নিয়ে আসার মানেই হলো, তিনি বেঁচে গেলেন। এখন দুনিয়ার মানুষ জানেন, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের হাতে বন্দি । সুতরাং এখন তাঁকে মেরে ফেলা সহজ নয়। তদুপরি মারার ইচ্ছে থাকলে, ঢাকা ক্র্যাকডাউনের সময় মেরে ফেলতে পারত।

বাবার মতের সাথে তাঁদের কলেজ পড়ুয়া ছেলে কামরানও একমত হলো। কামরান বলল, বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানে নিয়ে আসার মানে তুরুপের তাস হাতে রাখা। বাঙালি জাতিকে ঠান্ডা করতে হলে বঙ্গবন্ধুকে দরকার। সুতরাং সাময়িকভাবে হলেও তিনি নিরাপদ।

১৭ বছর বয়েসি কামরান করাচি মোহাম্মদ আলী সরকারি কলেজে প্রথম বর্ষের বিজ্ঞানের ছাত্র। করাচিতে বাঙালি ছেলেদের একটা গোপন সমিতি আছে। কামরান সেই সমিতির সাধারণ সম্পাদক।

খাবার টেবিলে সিদ্ধান্ত হলো, আগামীকাল সকালে করাচি হাইকোর্টে গিয়ে রেজিস্ট্রার এনায়েত করিমের সাথে দেখা করে তাঁকে বঙ্গবন্ধুর সংবাদটি পৌঁছাবেন বোরহান খান নিজে।

বোরহান খানের ডিউটি দুপুর দুইটা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। সুতরাং হাতে বেশ সময় রেখেই ঘর থেকে বের হলেন তিনি। হাইকোর্টে যখন তিনি পৌঁছান তখন বেলা এগারোটা। আদালতের কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হয়েছে। রেজিস্ট্রার অফিস লোকে লোকারণ্য। অনেকক্ষণ পর বোরহান খানের সুযোগ এল। পরিষ্কার বাংলায় নিজের পরিচয় দিলেন তিনি। এনায়েত করিম খুবই বিস্মিত হলেন। কিন্তু সেটা প্রকাশ হতে দেননি। চোখে চোখে কথা হলো। এনায়েত করিম উঠে খাস কামরার দিকে এগিয়ে গেলেন। বোরহান খান তাঁকে অনুসরণ করলেন।

খাস কামরায় প্রবেশ করে খুব নিম্নস্বরে এনায়েত করিম প্রশ্নবোধক চোখে বোরহান খানের দিকে চাইলেন। খুব অল্প কথায় বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত সংবাদটি বর্ণনা করলেন তিনি। সংবাদ শুনে এনায়েত করিমের

চেহারা সাদা কাগজের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ভগ্নকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, ওহ্ আল্লাহ।

দুইটার আগে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে বোরহান খানকে। তাই সময় নষ্ট না করে হাইকোর্ট ছাড়লেন তিনি। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। আগামী জীবনে আর কখনো বোরহান খান তাঁর কর্মস্থলে পৌঁছাতে পারেননি। দেখা হয়নি তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী-পুত্র ও কন্যার সাথে।

৩.

করাচি এয়ারপোর্টের ভিআইপি লাউঞ্জে যখন বোরহান খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে নাশতা পরিবেশনকালে নিম্নস্বরে আলাপ করছিলেন, তখনই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন পাকিস্তান সেনাগোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা। গভীরভাবে তাঁকে লক্ষ করে বুঝতে পারেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কিছু একটা তথ্য পাচার করছেন এভিয়েশন সিকিউরিটি ইনচার্জ বোরহান উদ্দিন খানের কাছে।

সেনা গোয়েন্দারা হতবাক হয়েছেন। উর্দুভাষী একজন পাকিস্তানির সাথে বাঙালি গাদ্দারের কী এমন সখ্যতা? সেনা গোয়েন্দাদের লিপরিডিং এক্সপার্টরা জানিয়েছেন। ওদের কথাগুলো বাংলাতেই হয়েছে। তখনই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছেন। বোরহান খানকে চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারিতে রাখতে। সেই থেকে তিনি গোয়েন্দাদের নজরদারিতে ছিলেন। রেজিস্ট্রার অফিস থেকে বের হয়ে হাইকোর্ট গেইটে পৌঁছার সাথে সাথেই সেনা গোয়েন্দারা তাঁকে আটক করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। এরপর থেকে তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

রাত এগারোটায়ও বাসায় এসে পৌঁছাননি বোরহান খান। রাবেয়া সুলতানা অবাক হয়ে যান। তাঁর স্বামী কখনো এতরাত অবধি বাইরে থাকেন না। কোনো কারণে দেরি হলে তিনি বাসায় ফোন করে জানিয়ে দেন। অথচ আজ এতরাত অবধি তিনি বাসায় ফিরেননি। ফোনও করেননি। খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন তিনি। কামরানকে ঘুম থেকে তুলে তাকে জানালেন তার বাবার দেরির কথা। কামরানও বিস্মিত হলো। এত দেরি করেন না তার বাবা। কিন্তু সে বিচলিত না হয়ে ক্র্যাডল থেকে ফোন তুলে তার বাবার অফিসে ডায়াল করল। অফিস থেকে জানানো হলো, বোরহান সাহেব আজ অফিসেই আসেননি।

বাবা অফিসেই যাননি। একথা শোনার সাথে সাথেই কামরানের মাথা ভোঁ ভোঁ করে চক্কর দিয়ে উঠল। ছেলের চেহারা দেখে রাবেয়ার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার স্বামী অফিসেই যাননি শোনার সাথেই তিনি সোফার উপর ধপাস করে বসে পড়লেন। অজানা শঙ্কায় তার বুক ধড়ফড় করে উঠল।

মাকে সান্ত্বনা দিয়ে কামরান বলল, শান্ত হন আম্মা। আমি দুলাভাইকে ফোন দিচ্ছি। তিনি আসুক। তারপর আমরা বাবার খোঁজে বের হব।

বোরহান- রাবেয়ার এক মেয়ে ও এক ছেলের সুখের সংসার। দু'বছর আগে মেয়ে পারভিন সোহানার বিয়ে হয়েছে এক সিন্ধি ব্যবসায়ী যুবকের সাথে। করাচির সবজিমন্ডি এলাকায় ওদের বাড়ি। সোহানার শ্বশুর প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ। তিনি পাকিস্তান পিপলস পার্টির করাচি শহর শাখার সভাপতি। প্রচুর ক্ষমতা রাখেন।

কামরানের ফোন পাওয়ার বিশ মিনিটের মাথায় সোহানার স্বামী আবদুল্লা ইউসুফ হাজির হয়েছে সেখানে। সব ঘটনা শুনে সেও বিচলিত হয়ে পড়ল। কিন্তু ধৈর্য হারালো না। সে কামরানকে বলল, চল আমরা বের হই। প্রথমে যেতে হবে করাচি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার এনায়েত সাহেবের বাসায়।

করাচি জাজেস কমপ্লেক্স-এ থাকেন বিচারপতিরা। সেখানেই থাকেন এনায়েত করিম। আবদুল্লাহ ইউসুফ সেটা জানে। রাত বারোটায় কলিং বেল শুনে ঘুম থেকে উঠে নিজেই দরজা খুললেন বাঙালি এনায়েত করিম।

অবাক হয়ে তাকালেন আগন্তুক দু'জনের দিকে। কোনো ভূমিকা ছাড়াই আবদুল্লাহ ইউসুফ নিজেদের পরিচয় দিল। মেহমানকে ভেতরে ডাকার কথাও ভুলে গেলেন তিনি। এতই অবাক হয়েছেন অভিজ্ঞ বিচারপতি। বোরহান সাহেব অফিসেও যাননি। বাসায়ও ফেরেননি। এটা শোনার পর মরার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন তিনি। বুঝতে পারলেন,

পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফেরার পথে ভারত বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু

বোরহান খান নিজেও কবরে গেছেন, তার জন্যও করব খুঁড়ে রেখে গেছেন। পাকিস্তানের ইতিহাস তার জানা। ২৩ বছর ধরে তিনি বিচারক। এদের স্বভাব তাঁর নদখর্পণে।

অত্যন্ত হতাশ কণ্ঠে তিনি আবদুল্লাহ ইউসুফকে বললেন, যা হবার হয়েছে। একটাই সুখ। আমার স্ত্রী ও কন্যা বাংলাদেশে। আমার হারাবার কিছুই নেই। তবুও বাঁচতে চাই। কীভাবে সম্ভব জানি না।

আবদুল্লাহ বলল, কোনো চিন্তা করবেন না, স্যার। পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায় থাকবেন আপনি। প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিস নিয়ে আসুন আমার সাথে। বাদবাকি কথা আমার গাড়িতে হবে।

মাত্র দশ মিনিটের মাথায় আবদুল্লাহ ইউসুফের টয়োটা করল্লা করাচি জাজেস কমপ্লেক্স ছেড়ে সবজিমন্ডির দিকে রওয়ানা হলো। গাড়িতে বসার পরপরই এনায়েত করিম বেহুশ হয়ে পড়েন। সোহানার জামাই বুঝতে পারে। তাঁর শ্বশুর বিপদে পড়েছেন। তাঁর সেই বিপদ দ্রুত এগিয়ে আসছে ভয়ংকর রূপে। তাই এনায়েত করিমকে সোজা নিয়ে গেল তার বাড়িতে। এনায়েত করিমের জন্য সবচাইতে নিরাপদ জায়গা।

রাত ঠিক দুটোর সময় পাকিস্তানি সেনা গোয়েন্দারা করাচি জাজেস কমপ্লেক্স-এ এনায়েত করিমের বাসা ঘেরাও করে। ওখানে কাউকে না পেয়ে ওরা হতভম্ব হয়ে যায়। সেনারা বুঝতে পারে। বড়ো কোনো মাথা এর পেছনে কাজ করছে। কিন্তু কোন সে মাথা! সেটা বুঝতে পারে না।

রাত সাড়ে তিনটায় করাচি স্টেশন হেড কোয়ার্টার থেকে হুকুম আসে, গাদ্দার বোরহানের বাড়ি তল্লাশি চালাও। কিন্তু সেখানেও তারা ব্যর্থ। এনায়েত করিমকে সেখানে পাওয়া যায়নি। কামরান ও তার মা এমন অভিনয় করলেন। সেনারা ধরেই নিল, এরা পুরো অন্ধকারে। কিছুই জানে না।

কামরান, রাবেয়া, সোহানা, আবদুল্লাহ ইউসুফ- কেউই জানে না, পাকিস্তানি সেনা গোয়েন্দারা কী নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়েছে বোরহান উদ্দিন খানের উপর।

গাদ্দার শেখ মুজিবের সাথে তাঁর কী গোপন কথা হয়েছে। কী তথ্য তাঁর কাছে সরবরাহ করেছে, তা জানার জন্য, এমন কোনো টরচার নেই, যা বোরহান খানের উপর প্রয়োগ করা করেনি পাকিস্তানি নরপশুরা।

অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি বঙ্গবন্ধুর বলা তথ্যটা তাদেরকে জানান। তথ্যটা জানার সঙ্গে সঙ্গেই সেনা গোয়েন্দারা জাজেস কমপ্লেক্সে এনায়েত করিমকে ধরতে যান। তাঁকে না পেয়ে সে রাতেই আরো তথ্য পাওয়ার জন্য বোরহান খানকে ট্রুথসিরাম ইনজেকশন পুশ করে গোয়েন্দারা। এরপর আধা-ঘণ্টার মধ্যেই মারা যান ভারতের রায়বেরিলিতে জন্ম নেওয়া উর্দুভাষী বাঙালি প্রেমিক বোরহান উদ্দিন খান।

এনায়েত করিমকে পাওয়ার জন্য সেনা গোয়েন্দারা পুরো করাচি শহর চষে ফেলেছে। কিন্তু তাঁকে আর পাওয়া যায়নি। না পাওয়ার কারণ, সোহানার জামাই পরদিন ভোরে বিশেষ ব্যবস্থায় সিন্দু প্রদেশের চাদবেদ সীমান্ত দিয়ে এনায়েত সাহেবকে ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

৪.

এ ঘটনার দু'সপ্তাহ পর। কামরানের গোপন বাঙালি গ্রুপ সদস্যরা এক জায়গায় মিলিত হলো। বহু বাকবিতণ্ডার পর সিদ্ধান্ত হলো, করাচি ওয়েসটার্ন রিফাইনারি ধ্বংস করতে হবে। তাহলে পাকিস্তানের

মূল ভূখণ্ডেও মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে, এটা জানবে সারা পৃথিবী। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারাও অনুপ্রাণিত হবে।

ফিজিক্স-এর তিন ছাত্র দায়িত্ব নিল শক্তিশালী বিস্ফোরক তৈরির। তিনজন দায়িত্ব নিল, কীভাবে কোন দিক দিয়ে বিস্ফোরক বসিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে তা রেকি করার। ১৪ই এপ্রিল পহেলা বৈশাখের দিন যখন বাংলাদেশে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঢুকে পাকিস্তানি হায়েনারা বাঙালির ঘরবাড়ি সহায়-সম্পদ জ্বালিয়ে ধ্বংস করছিল। পাখির মতো মানুষ মেরে সাফ করছিল। তখন পাকিস্তানের করাচি শহরে ১১ জন তরুণ বাঙালি শিক্ষার্থী মিলে শুরু করেছিল মুক্তিযুদ্ধ।

আরব সাগরের পাড়ে সম্পূর্ণ অরক্ষিত পাকিস্তান ওয়েস্টার্ন রিফাইনারির সবচেয়ে বড়ো তৈলাধারের ডেলিভারি পাইপের সাথেই বিস্ফোরক লাগিয়েছে দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি ছেলে। মোট দু'লক্ষ গ্যালন জ্বালানি ধারণ ক্ষমতা রাখে এই তৈলাধারগুলো। কোনোরকমে আগুন লাগাতে পারলেই মুহূর্তেই সব শেষ হয়ে যাবে।

ওদের মধ্যে তড়িৎ প্রকৌশলের যে ছাত্র সেই নিয়েছে স্পার্কিং-এর দায়িত্ব। অন্তত আধামাইল দূর থেকে বিদ্যুৎ স্পার্কের মাধ্যমে বারুদের আগুন লাগার ব্যবস্থা নিয়েছে সে। এর চাইতে কম দূরত্বে আগুনের লেলিহান শিখায় ওরা অঙ্গার হয়ে যেতে পারে।

করাচিতে গ্রীষ্মকালে সূর্য ডোবে সন্ধ্যা সাড়ে ৮টা পৌনে ৯টায়। ছেলেরা অন্ধকার সময়টাই বেছে নিয়েছে। রাত সাড়ে ৯টায় প্রথম বিস্ফোরণটা ঘটল। এর ১০ সেকেন্ড পর দ্বিতীয় তৈলাধারের বিস্ফোরণ হয়। পর্যায়ক্রমে ৮টি তৈলাধারের সবকয়টি বিস্ফোরিত হতে দেখল ছেলেরা। পেট্রোলের লেলিহান শিখায় পুরো সিন্দু প্রদেশ দিনের মতো আলোকিত হয়ে পড়ল। দুই তরুণ যোদ্ধা শতশত পলায়নপর মানুষের সাথে নিজেরাও শামিল হলো।

সমস্ত পৃথিবী দেখল পাকিস্তানের প্রধান জ্বালানি সরবরাহ লাইন কোনো কারণ ছাড়াই ধ্বংস হয়ে পড়ল। মোট চারদিন ধরে জ্বলেছে তৈলাধার ও আশপাশ। কোনো শক্তি দিয়েই আগুন নেভানো যায়নি। ঠিক একমাস পর ওরা ১১ জন আবার মিলিত হলো করাচি থেকে দশ মাইল দূরে একটি নির্জন পার্কে। বহু শলা-পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হলো পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের যুদ্ধবিমান ধ্বংস করতে হবে এবার। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হলো ওয়ারেন্ট অফিসার হাবিবুল বাশারের ছেলে নাজমুল হাবিবকে। ওরা এয়ারফোর্স বেসেই থাকে। সুতরাং কাজটা ওর জন্য সহজ।

করাচি ওয়েস্টার্ন রিফাইনারির ঘটনাকে পাকিস্তান সরকার দুর্ঘটনা হিসেবেই নিয়েছে। পাকিস্তানের ভূখণ্ডে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ঢেউ লাগতে পারে। কেউ অন্তর্ঘাত চালাতে পারে। এটা পাকিস্তানিদের মাথায় আসেনি। ফলে ওরা ১১ জন পুরোদমে কাজ চালাতে বাধাগ্রস্ত হয়নি।

৫ দিন পর ১০টি ডেটোনেটর দেওয়া হলো নাজমুলকে। কোনো কেরামতির দরকার নেই। ডেটোনেটরগুলো হ্যাঙ্গারে রক্ষিত যুদ্ধবিমানের জেড প্রফেলারের সামনে দিয়ে ঠেলে দিলেই হবে। বাদবাকি কাজ ইঞ্জিন স্টার্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সমাধা হয়ে যাবে। ফসফরাস ভরা ডেটোনেটরে পাখার ঘর্ষণ আর ধাক্কায় যে বিস্ফোরণ ঘটবে, তাতেই কেল্লা ফতে হবে।

মে মাসের ৪ তারিখ ঘটল ঘটনা। এক হ্যাঙ্গারে ছিল ৬টি চায়না নির্মিত মিগ-২১। নাজমুল সবকটি ডেটোনেটর একটা প্রফেলারে রাখতে পেরেছিল। খুব বিপদজনক ছিল কাজটি। তবুও সে পেরেছে।

সকালে রুটিন ফ্লাইটে ওড়ার জন্য পাঞ্জাবি পাইলট আর ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার ককপিটে বসে ইঞ্জিন স্টার্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণটা ঘটে। ২০ সেকেন্ডের মধ্যে ১নং হ্যাঙ্গারে রক্ষিত ৬টি মিগ-২১ যুদ্ধবিমান একটার পর একটা বুম বুম করে ফুটেছে আর পুরো করাচিতে ভূমিকম্প ঘটিয়েছে।

এবার আর এই ঘটনাকে দুর্ঘটনা হিসেবে নেয়নি পাকিস্তান সরকার। সেই দিন থেকে পাকিস্তানের সব গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় রেড এলার্ড জারি করা হয়। কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়া হয়। সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে বাঙালি অফিসার ও কর্মচারীকে জেলখানায় বন্দি করা হয়। পাকিস্তানের স্কুল-কলেজের সব বাঙালি ছেলেকে নজরবন্দি করা হয়। ওরা ১১ জনও নজরবন্দি হয়। ফলে পাকিস্তানে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ স্তিমিত হয়ে পড়ে।■

শিশু-কিশোরদের ভাবনায় স্বাধীনতা

‘এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনল যারা,আমরা তোমাদের ভুলবো না।’

মার্চ মাস! এক আগুন ঝরার মাস। স্বাধীনতা অর্জনের মাস। লক্ষ প্রাণের আত্মত্যাগের মাস। অনেক সাধনা ও সংগ্রামের পর ১৯৪৭ সালে আমরা একবার স্বাধীনতা লাভ করেছিলাম। কিন্তু সেই স্বাধীনতা আমরা সঠিকভাবে পাইনি। স্বাধীনতা পেয়েও আমরা আমাদের অধিকারগুলো অর্জন করতে পারিনি। আমাদের যারা মূল শাসক ছিল তারা আমাদের সাথে প্রতারণা করেছে, আমাদের ন্যায়নিষ্ঠ অধিকার হরণ করেছে। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা যে সত্যিকারের স্বাধীনতা ছিল না তা আমাদের বুঝতে খানিক সময় লেগেছিল। অবশেষে আমরা বুঝতে পারলাম এবং নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম শুরু করলাম। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর। মধ্যখানের ৯টি মাস ছিল গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ। সত্যিকারের স্বাধীনতা পেতে আমাদের একটু সময় লেগেছিল। যুদ্ধ, রক্ত, সংগ্রাম আর বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতা। এই লাল-সবুজের পতাকার মূল্যও তাই এত বেশি। বড়োদের মতো আমাদের ছোটো ছেলে-মেয়েরাও ভাবে গৌরবময় ইতিহাসের এই দিনগুলোকে নিয়ে। তাদের মুক্তিযুদ্ধ দেখার সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু তারা বইপুস্তক পড়ে কিংবা বড়োদের থেকে শোনার চেষ্টা করে। জানতে চায় সোনালি ইতিহাসের কথা। স্বাধীনতা নিয়ে ছোটোদের ভাবনা আর মনের ভেতর জমে থাকা সব কথা জানাচ্ছেন নবারুণের বন্ধু **রুমান হাফিজ**

মুক্তিযুদ্ধের প্রচার বেশি বেশি চাই

ইয়া সুলতানা মৌসুমী

ইংরেজদের পর থেকেই পাকিস্তানিরা ভাষা, ঐতিহ্য, ধর্মসহ নানাভাবে বাঙালিদের উপর অত্যাচার করতে থাকে। এ সকল অন্যায় থেকে মুক্তির দাবিতে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তারপর দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের মধ্যে কত বীর প্রাণ দিয়েছেন, কত মা কেঁদেছেন, কত বীরাঙ্গনার সম্ভ্রমহানি ঘটেছে। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাঙালি পেয়েছে তাদের স্বাধীনতা। প্রতিটি সংবাদপত্রে ‘মুক্তিযুদ্ধ’ নামক পাতা খোলা হোক এবং টেলিভিশন মিডিয়াতে যেন ‘মুক্তিযুদ্ধ’ নিয়ে প্রতিদিন একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয় এই প্রত্যাশা করি।

দশম শ্রেণি, শাহজালাল উপশহর হাই স্কুল, সিলেট।

শিশুদের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে হবে

অনন্য যারিফ আকন্দ

২৬শে মার্চ বাংলাদেশের জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তারপর দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি লাল-সবুজের পতাকা, সোনার বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’। আজকের শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে শিশুদের

প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তিতে তাদের পারদর্শী করে তুলতে হবে। আমি মনে করি, বড়োদের মতো শিশুদেরও রয়েছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা। নিজের মতো কাজ করার অধিকার। তাই প্রত্যেক শিশুর ভালোলাগা-মন্দলাগা বা পছন্দ-অপছন্দের প্রাধান্য দিতে হবে।

পঞ্চম শ্রেণি, দি হলি চাইল্ড স্কুল, মানিকগঞ্জ।

আমাদের গৌরবময় দিন

জুয়ারিয়া জাহান নুসাইবা

স্বাধীনতা দিবস জাতীয় জীবনের গৌরব ও তাৎপর্যময় দিন। স্বাধীনতা দিবস হলো জাতীয় জীবনের অগ্রগতির প্রতীক। স্বাধীনতা দিবসের আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তের মধ্যে প্রথমেই আমাদের যে কথা মনে পড়ে, তা হলো এ দেশের অসংখ্য দেশপ্রেমিক শহিদদের আত্মদান। লক্ষ লক্ষ শহিদদের রক্তে রাঙানো আমাদের স্বাধীনতার সূর্য। এ জন্য আমাদের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা দিবস সবচাইতে গৌরবময় দিন। এ দিনটি আমাদের দিয়েছে একটি স্বাধীন দেশ ও লাল সবুজ পতাকা।

দশম শ্রেণি, আগ্রাবাদ বালিকা বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে

জাহেদ জয়

পাকবাহিনীর শাসন শোষণের মাত্রা যখন ছাড়িয়ে যাচ্ছিল তখনই এদেশের আপামর জনগণ তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের দেশকে রক্ষা করতে এবং অধিকার আদায় করে নিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লাখো শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের এ দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। সেই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমাদের আজন্ম শ্রদ্ধা। তাদের এ ঋণ আমরা কখনো শোধ করতে পারব না। তবে তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া লাল-সবুজের এই দেশের অর্জিত স্বাধীনতাকে যেন আমরা রক্ষা করতে পারি। এজন্য আমাদের সবাইকে একসাথে থেকে এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। কারণ আমরা সবাই জানি, স্বাধীনতা অর্জনের চাইতে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।

একাদশ শ্রেণি, সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ হোক

উম্মুল খয়ির ফাতিমা

সময়ের চক্রাকারে ঘুরে প্রতি বছর বাঙালিরা যে মহিমান্বিত দিন পালনের জন্য উৎসাহী থাকে, তা আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস-২৬শে মার্চ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমরা ফুল দিয়ে শহিদদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি সত্য কিন্তু আদৌ কি সেই মূল্য আমরা দিতে পেরেছি? পরের দিনের সূর্য ওঠার আগেই শ্রদ্ধাঞ্জলির ফুল মরে যায় আর আমাদের দেশপ্রেমও। আমরা নতুন প্রজন্ম দেখিনি সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তাই ‘নোঙর তোল তোল! সময় যে হলো হলো! নোঙর তোল তোল!’ গান মনে কখনো বেজে ওঠে না। তবু আমরা বঙ্গবন্ধুর ‘সোনার বাংলা’ গড়ার স্বপ্ন বুকে নিয়েই অপেক্ষা করি রোজ। ‘আমার সোনার বাংলা’ গেয়েই প্রতিটি ছাত্র প্রতিদিন নিজেকে গড়ে তুলে। তাই এখনো ২৬শে মার্চ সূর্য উঠতে না উঠতেই চায়ের দোকানের টিভিতে প্রচারিত হতে দেখা যায়।

‘জয় বাংলা বাংলার জয়, হবে হবে হবে, হবে নিশ্চয়,
কোটি প্রাণ এক সাথে জেগেছে অন্ধরাতে, নতুন সূর্য ওঠার এই তো সময়।’ ■

দশম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

কাউন্টডাউন ২০২১

স্বাধীনতার ৫০ বছর

জান্নাতে রোজী

বাংলাদেশ ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করবে। আর এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে এর কাউন্টডাউন। কারণ ২০২১ সাল বাংলাদেশ জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর। শুধু স্বাধীনতার ৫০ বছরের জন্য নয়, এ বছরই বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশের চূড়ান্ত স্বীকৃতি পাওয়ার কথা। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের মানদণ্ড অনুযায়ী, গড় মাথাপিছু জাতীয় আয়, মানবসম্পদ সূচক ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি সূচক-এই তিনটিতে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সক্ষমতা অর্জন করে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে।

কিছু সমালোচকের দৃষ্টিতে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে আখ্যায়িত বাংলাদেশ আজ বিশ্বসভায় উন্নয়নের 'রোল মডেল'। স্বাধীনতার পরে যারা বলেছিল, বাংলাদেশের অর্থনীতি অত্যন্ত ভঙ্গুর- এটা টেকে কি টেকে না, তাই সন্দেহ, তারাই আজ বাংলাদেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

সেই ১৯৭১ সালেই স্বাধীনতা লাভের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার কঠিন সংগ্রামের মধ্যেও এদেশের মানুষকে 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে শুরু করেছিলেন 'সবুজ বিপ্লব'। গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূল স্তম্ভ ঘোষণা করে মাত্র ১১ মাসের মধ্যে জাতিকে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর দেখানো পথ ধরেই বাংলার জনগণ তাদের মেধা আর শ্রম দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

২০০৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন বাংলাদেশের মানুষকে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে লক্ষ্য নির্ধারণ করে মধ্য আয়ের এক সমৃদ্ধ দেশ গড়া ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ এই লক্ষ্যের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কাঙ্ক্ষিত চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে প্রধানমন্ত্রী প্রণয়ন করেছেন ভিশন-২০২১। ভিশন ২০২১-এর লক্ষ্যসমূহ দেখা যেতে পারে যার অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সক্ষমতা অর্জন করেছে।

- প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার ১০০ ভাগ নিশ্চিত করা
- সব মানুষের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা
- বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা
- প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের আওতায় আনা
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে উন্নীত করা
- দেশের শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা
- পর্যায়ক্রমে স্নাতক পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা
- নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা
- সকল মানুষের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা
- জাতীয় আয়ের হিস্যা কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত বৃদ্ধি করা
- বেকারত্বের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা
- কৃষি খাতে শ্রমশক্তি ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনা
- দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা
- তথ্যপ্রযুক্তিতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে বাংলাদেশকে পরিচিত করা
- ৮৫ শতাংশ নাগরিকের মানসম্পন্ন পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিদিন ন্যূনতম ২১২২ কিলোক্যালরি খাদ্য নিশ্চিত করা
- সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি নির্মূল করা
- গড় আয়ুষ্কাল ৭০-এর কোঠায় উন্নীত করা
- শিশুমৃত্যুর হার ১৫-তে নামিয়ে আনা
- মাতৃমৃত্যুর হার ১.৫ এ নামিয়ে আনা। ■

নবারুণ বন্ধুদের বই

বই: টুপিটুন
লেখক: মীম নোশিন নাওয়াল খান
প্রচ্ছদ: ধ্রুব এষ
প্রকাশক: বিদ্যাপ্রকাশ
মূল্য: ১৫০ টাকা
বইয়ের ধরন: মীনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত ছয়টি গল্প এবং আরো অনেকগুলো শিশু-কিশোর উপযোগী গল্প নিয়ে সাজানো হয়েছে টুপিটুন। শিশু-কিশোর উপযোগী হলেও গল্পগুলো সকল বয়েসি পাঠকদেরকে আনন্দ দেবে, উন্মোচন করবে ভাবনার নতুন জগৎ।

বই: ওদের পাশে আমরা
লেখক: ফারিহা আহসান অভ্র
প্রচ্ছদ: আলেয়া বেগম আলো
প্রকাশক: পাতা প্রকাশনী
মূল্য: ১৮০ টাকা।
বইয়ের ধরন: শিশু-কিশোর উপযোগী আটটি গল্প দিয়ে সাজানো চার রঙে বর্ণিল বইটি। মায়াময় ভাষা আর ভাবনার চমৎকারিত্বে এই বই পাঠককে মুগ্ধ করবেই।

আফিয়া মাহমুদা লামিশা, তৃতীয় শ্রেণি, রাবেয়া মোশাররফ ক্যাডেট একাডেমি, গোপালগঞ্জ

জন্ম : ১লা জানুয়ারি ১৯৫৬ ❑ মৃত্যু: ২২শে জানুয়ারি ২০১৯

আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল

মুক্তির যোদ্ধা ও কালজয়ী সুরস্রষ্টা

মোমিন মেহেদী

আমাদের বুলবুল গাইবে না গান আর
গানে গানে স্বাধীনতা চাইবে না তান আর
তবু বলি- ভালোবাসি-ভালোবাসি সত্যি
তাড়াতে তৈরি রবো সমাজের দৈত্যি!

গীতিকার-সুরকার, বীরমুক্তিযোদ্ধা, সকল প্রজন্মের প্রিয় মানুষ আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল নতুনের কেতন নিয়ে এগিয়ে গেছেন সারা জীবন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে স্বাধীনতা যুদ্ধে গিয়েছিলেন। বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। দেশের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা আর মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ আন্তরিকতায় অগ্রসর হতে হতে তিনি নির্মাণ করেছেন নিজস্ব অবস্থান। ভালোবাসার বাংলাদেশকে নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে তিনি নির্মাণ করেছেন 'সবকটা জানালা খুলে দাও না...'র মতো বিখ্যাত গান। যে গান বাজলে বুকের মাঝে বাজে ভালোবাসার ঝুনঝুনি। আমাদের দেশে স্বাধীনতা-স্বাধিকার আর চেতনার গান নির্মাণে নিবেদিত মানুষ আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের হাত দিয়ে উঠে এসেছেন অসংখ্য কণ্ঠশিল্পী। তাঁর অসংখ্য গান হাজার বছর বেঁচে থাকবে বাংলাদেশ আর মানুষকে ভালোবাসার কারণে।

আমার সাথে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় ২০০১ সালে। সংবাদকর্মী হিসেবে আমি একটি প্রতিবেদন করেছিলাম তাকে নিয়ে। এরপর প্রায়ই দেখা হতো, কথা হতো। ২০০৭ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের গীতিকার হিসেবে তালিকাভুক্ত হলে তিনি বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'গান আসে সর্বোচ্চ ভালোবাসায়-সততায়। অসৎ মানুষ সংগীত শিল্পী হলেও সংগীতে টেকে না।' কানে বাজছে অমর এই অমীয় বাণী। নিরলস সংগীতমুখী মানুষ তাই, তাঁকে হারানোর বেদনায় যেন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি ক্রমশ। মনে হচ্ছে আমার প্রিয় অভিভাবককেই শুধু হারাইনি, হারিয়েছি ভালোবাসার মানুষকেও।

গানের অ্যালবাম তৈরি থেকে শুরু করে উপহার দিয়েছেন বাংলা চলচ্চিত্রের অসংখ্য মানসম্মত গান, যা আজও শ্রোতামহলে বেশ জনপ্রিয়। ১৯৭৮ সালে 'মেঘ বিজলি বাদল' ছবিতে সংগীত পরিচালনার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে কাজ শুরু করেন আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল। বুলবুল অসংখ্য গানে সুর করেছেন, যার অধিকাংশ গানই তার নিজের রচিত। এসব গানে কণ্ঠ দিয়েছেন এন্ড্রু কিশোর, সাবিনা ইয়াসমিন, রুনা লায়লা, সামিনা চৌধুরী ও জেমসসহ দেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পীরা।

সুর সম্রাট আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল-এর ভালোবাসার সংগীতের রাজত্ব জুড়ে রয়েছে দেশ, চেতনা, স্বাধীনতা, বাবা, মা আর সম্ভাবনার গান। যেমন- আমার বাবার মুখে প্রথম যেদিন শুনেছিলাম গান, সেদিন থেকে গানই জীবন, গানই আমার প্রাণ...

তাঁর অফুরন্ত গানের ভাণ্ডারে রয়েছে-'সব কটা জানালা খুলে দাও না', 'মাঝি নাও ছাইড়া দে ও মাঝি পাল উড়াইয়া দে', 'সেই রেললাইনের ধারে, সুন্দর সুবর্ণ তারুণ্য লাবণ্য', 'ও আমার আট কোটি ফুল দেখ গো মালি', 'মাগো আর তোমাকে ঘুম পাড়ানি মাসি হতে দেব না', 'একতারা লাগে না আমার দোতারাও লাগে না', 'আমার সারা দেহ খেয়ো গো মাটি', 'আমার বুকের মধ্যেখানে', 'আমার বাবার মুখে প্রথম যেদিন', 'ও আমার মন কান্দে, ও আমার প্রাণ কান্দে', 'আইলো দারুণ ফাগুনরে', 'কত মানুষ ভবের বাজারে', 'তুই ছাড়া কে আছে আমার জগৎ সংসারে', 'বাজারে যাচাই করে দেখিনি তো দাম', 'আম্মাজান আম্মাজান', 'আমার জানের জান আমার আব্বাজান', 'ঈশ্বর আল্লাহ বিধাতা জানে', 'এই বুকে বইছে যমুনা', 'একাত্তরের মা জননী কোথায় তোমার মুক্তিসেনার দল', 'বিদ্যালয় মোদের বিদ্যালয় এখানে সভ্যতারই ফুল ফোটানো হয়', 'আমায় অনেক বড়ো ডিগ্রি দিছে', 'পৃথিবী তো দুদিনেরই বাসা, দুদিনেই ভাঙে খেলাঘর', 'নদী চায় চলতে, তারা যায় জ্বলতে', 'চতুর্দোলায় ঘুমিয়ে আমি ঘুমন্ত এক শিশু', 'আকাশটা নীল মেঘগুলো সাদা সাদা'সহ আরো অনেক গান।

নিখাদ যোদ্ধা হওয়ায় তাঁর প্রতিটি গানে নেমে এসেছে দেশের প্রতি ভালোবাসার জোয়ার। যেই জোয়ারের সূত্র ধরে তিনি রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদক, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং রাষ্ট্রপতির পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর মতো দেশকে ভালোবাসবে তোমরাও। দেশের প্রতি মমতায় জেগে উঠুক তোমাদের কণ্ঠে তাঁর সেই গান-

একটি কথাই শুধু আমি বলে যেতে চাই,
বাংলা আমার আমি যে তার
আর তো চাওয়া নাই রে...
আর তো চাওয়া নাই... ■

আরশাফিন বারী পাপান, দ্বিতীয় শ্রেণি, সেন্ট টমাস মিশন প্রাইমারি স্কুল

গল্প

এক যে ছিল ময়না

জোহরা শিউলী

'মা ময়না আমাদের সোফায় বসেছে।' অভিযোগ ছোট্ট পৃথ্বীর।

'কোনো সমস্যা নেই মা। মাঝে মাঝে বসতে পারে ও।' জবাব দেন মা।

'মুসকানদের বাসার লাকি তো বসে না'- এক রকমের চিৎকার পৃথ্বীর।

'মুসকান আর আমাদের সোফায় বসবে না। কারণ ময়না এই সোফায় বসেছে।' কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে জানায় সে।

মা এতক্ষণে বুঝতে পারেন। পৃথ্বী কেন এমন আচরণ করেছে। কারণ মা তো কখনো ময়না কে আলাদা করেন না। এই বাসার সবার মতোই ময়না থাকে। পৃথ্বী যা দিয়ে খেলে। ময়নাও তা দিয়ে খেলে।

এমনকি খাবার ও পরনের জামাকাপড়ের বেলায়ও। পৃথ্বীর জন্য চিপস কিনেন মা। সাথে ময়নার জন্যও। পৃথ্বী চকলেট খায়। ময়না তা থেকে ভাগ পায়। অথবা ময়নার জন্যও আলাদা চকলেট। মা যা রান্না করেন দুজনের জন্য-ই। যখন পৃথ্বীর নতুন জামা কেনা হয় তখন ময়নার জন্যও কেনা হয়। ময়না পৃথ্বীর দেখাশোনা করে। পৃথ্বীর স্কুলের বন্ধুরা তাদের বাসার সাহায্যকারীকে কাজের মেয়ে বলে। মা শিখিয়েছেন ময়না তার বন্ধু। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মতোই আরেকজন মানুষ।

আজ হঠাৎ তার এমন আচরণে বিস্মিত মা। রীতিমতো চিৎকার। ময়না কাজের মেয়ে। ওর সোফায় বসা মানা। ময়না বসেছে, তাই মুসকান পৃথ্বীদের সোফায় আর বসবে না। মুসকান তাকে বলেছে। মুসকান পৃথ্বীর স্কুলের বন্ধু। মাঝে মাঝে বাসায় আসে খেলতে। মুসকান-তাসবিয়া-পৃথ্বী একসাথে খেলে ওরা। বাসা কাছাকাছি হওয়ায় স্কুলে যাবার সময়ও একসাথে যায়। আবার ফেরার সময়ও। হাত ধরে তিনজন বাসায় ফিরে। তাদের সঙ্গে ময়নাও স্কুল থেকে বাসায় ফিরে। ময়না ক্লাস ফাইভে পড়ে। মা একদিন খেয়াল করেছে স্কুল থেকে ফেরার পথে মুসকান কখনো ময়নার হাত ধরে না। এমনকি পৃথ্বী ধরুক সেটাও চায় না। মায়ের মন খারাপ হয়।

ওরা তিন-চার জন একসঙ্গে খেলে। ময়নাও তাদের খেলার সঙ্গী। সবাই মিলে একসঙ্গে খেলে। এরপর রাতের খাবার। তো এতদিন তারা একসঙ্গেই খেলছিল। হঠাৎ করে ময়নাকে আলাদা করে দেবার চিন্তাটা পৃথ্বীর মাথায় কেন আসলো। মা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। বেশ কয়েকদিন যাবত-ই খেয়াল করছিলেন ময়না কোনো খেলনায় হাত দিলেই পৃথ্বী তার সাথে চেঁচিয়ে উঠে। ময়নাকে খেলতে দিবে না তার খেলনা নিয়ে। খেলতেও নিচ্ছে না তাদের সঙ্গে। আজ যখন জানল আসলে মুসকান চায় না তাদের সঙ্গে ময়না খেলুক,তখন মা বুঝতে পারল কেন ছোট্ট পৃথ্বীর এতদিনের রুটিনে হঠাৎ এমন পরিবর্তন।

ময়না আসলে পৃথ্বীদের ঘরের কাজে সহায়তাকারী। কাজের মেয়ে যে সোফায় বসেছে সেই সোফায় মুসকান বসবে না।

বন্ধুর এমন আচরণে ময়নার প্রতিও আচরণ বদলে গেছে পৃথ্বীর। মা-বাবা হঠাৎ এই পরিবর্তনে পৃথ্বীকে যত বোঝান কিন্তু কোনো বদল হয় না।

একদিন সন্ধ্যায়। 'কুমির তোর জলে নেমেছি' খেলছে তিনজনে মিলে। যথারীতি ময়না বাদ। মা মুসকানকে কোলে তুলে নেন। আদর করে পায়েস মুখে তুলে খাওয়ান। এরই মাঝে বোঝান, ময়না ঘরের টুকটাক কাজ করে। তাই বলে তো সে কাজের মেয়ে নয়। সে পৃথ্বীকে দেখাশোনা করে। পৃথ্বীর বন্ধু। তারা একসঙ্গেই খেলবে। একই রকম করে থাকবে। মানুষে মানুষে কখনো ভেদাভেদ করতে হয় না। হোক সে গরিব। গালে কট্রাস করে একটা চুমু দেয় মা মুসকানের। আর কখনো ময়নার সঙ্গে এমন আচরণ করবে না সে। কথা দেয়। বাকি বন্ধুরাও সমস্বরে বলে উঠে ময়না আবার আগের মতো তাদের বন্ধু। কখনো আর তারা ময়নাকে আলাদা মানুষ মনে করবে না। সূর্যাস্তের নরম নরম আলোয় মা সবাইকে ছাদে দিয়ে আসেন খেলার জন্য। মাথায় হাত বুলিয়ে ওদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটান।

ছাদ থেকে কয়েক সিঁড়ি নামতেই পেছন থেকে শুনতে পান ময়নাসহ সবাই একসঙ্গে খেলছে। আনমনে হেসে উঠেন মা। ■

আমাদের মার্চ

মুশফিকুর রহমান মিদুল

স্বাধীনতা মানে বয়ে চলা নদী নয়
স্বাধীনতা মানে ক্ষয়ে যাওয়া নদীর তীরও নয়
স্বাধীনতা মানে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙা বীর
স্বাধীনতা মানে বুক পেতে দাঁড়ানো হিমালয়ের মতো স্থির

স্বাধীনতা মানে কোটি মানুষের শাণিত ধনুক তীর
স্বাধীনতা মানে সম্মুখ সমরে লড়ে যায় যে বীর
স্বাধীনতা মানে লক্ষ শহিদের ঝরানো রক্ত
স্বাধীনতা মানে গৌরব গাথা উন্নত মম শির।

স্বাধীনতা

মো. জাহিন

স্বাধীনতা মানে
শিশুর নির্ভয় চাহনি
অবাধ দুরন্ত কৈশোর
অবারিত সবুজের ফসলের মাঠ
কিষাণের মুখে তৃপ্তির হাসি
ঘরে ঘরে ডিজিটালের ছোঁয়া
নিজস্ব স্যাটেলাইটে বিশ্ব ঘোরা
দেশ গড়ার দীপ্ত শপথ।

এসএসসি পরিক্ষার্থী, মতিঝিল মডেল স্কুল, ঢাকা

কবিতার হাট

উপদেশ

লিয়াকত আলী চৌধুরী

দোষী লোকের পক্ষ নেওয়া ঠিক নয়,
তাতে নির্দোষের প্রতি অবিচার হয়।
নির্দোষ লোক অন্তর সুখী করে তোলে,
দোষীরা নিজের প্রাণকে বিপদে ফেলে।
দোষীদের ভবিষ্যতে কোনো আশা নাই,
মনের বশে আঁধারে পথ চলে তাই।
নির্দোষী লোক ভবিষ্যতে পাবে সম্মান,
দোষীরা জ্ঞানের কথায় দেয় না কান
নির্দোষীদের মুক্ত বুকে অমৃত সুধা
দোষীদের প্রাণে রয়েছে ভীষণ ক্ষুধা
দোষীর অন্তরে ছলনা রয়েছে খালি
নির্দোষীর মুক্তি দাতা বড়ো শক্তিশালী
দোষীদের বুকে বাজে নিরাশার বাঁশি
নির্দোষীদের প্রভাতে ফোটে মুখে হাসি।

ইচ্ছে

জান্নাতা নিঝুম শিল্পী

ইচ্ছে আমার অনেক জাগে
দূর সীমানায় ছুটব,
মৌমাছিটার মতো হয়ে
ফুলের মধু লুটব।

দূর আকাশে গিয়ে আমি
তারার সাথে জুটব,
কোছা ভরে ওদের হাসি
আমিও তো খুঁটব।

নদীর কাছে গিয়ে আমি
শাপলা শালুক তুলব,
পাহাড় কেটে দুয়ার খানা
আমিই আগে খুলব।

বিজ্ঞানীদের গবেষণায়
ওদের সাথে থাকব,
নতুন নতুন প্রযুক্তিতে
আমিও হাত রাখব।

স্বাধীনতা

মো. আনোয়ার হোসেন

স্বাধীনতার জন্য
জীবন দিলেন যাঁরা
ভুলবো না কোনো দিন
সে সকল বীরসেনাদের আমরা।

আছেন তাঁরা সবার মাঝে
হয়ে চির অম্লান
শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি
তাদের আত্মদান।

৮ম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

মানুষ হবো

আজহার মাহমুদ

কালাম স্যার ক্লাসে এসে করল জিজ্ঞাসা,
বড়ো হয়ে কার আছে কী হওয়ার আশা।
মিতু বলে— ডাক্তার হবে, নিজাম বলে— ব্যাংকার;
নাহিদ নাকি ব্যবসা করবে, ফয়সাল হবে অফিসার।
অনিমেষ হবে বড়ো নেতা, রাহিদ হবে ক্রিকেটার,
তুষার-হাসান দুজন নাকি হবে ইঞ্জিনিয়ার।

সবার আশা শুনে স্যার চুপ করে বসে;
সবার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অল্প করে হাসে।
একটি কথা বলি তোমাদের রেখো সবাই মনে
মনে রাখলে কাজে আসবে তোমাদের জীবনে।
মানুষ হবো এটাই যেন সবার আশা হয়
মানুষ হলে করতে পারবে পৃথিবীটা জয়।

মিলেমিশে

মোহ্‌সেন আরা

আমি আছি আমাতে
তুমি আছ তোমাতে,
আসো নাকো বেড়াতে,
চাও শুধু এড়াতে।
জীবনের পাওয়াতে,
সবকিছু চাওয়াতে,
পাবে না যে কিছুতে
একা একা থাকাতে।
সুখ ভালোবাসাতে
মিলেমিশে থাকাতে,
আসো তুমি বেড়াতে

চেয়ো নাকো এড়াতে।

চিঠি

তাজ ইসলাম

ফুলের কাছে চিঠি দিলাম
প্রজাপতির নামে
চাঁদ-তারাকে দিলাম চিঠি
রঙিন মেঘের খামে
সমুদ্রকে চিঠি দিলাম
উতাল ঢেউয়ের ডাকে
হৃদয় খামে লিখছি চিঠি
কেবল আমার মাকে
ফিরত খামে আমার নামে
লিখল না কেউ আর
আমি শুধু ফিরত পেলাম
একটা চিঠি মা'র
সেই চিঠিতে মা লিখেছেন
বাবা সোনার চান
তোমার জন্য সকল সময়
কাঁদে আমার প্রাণ।

শবনম

ম. মীজানুর রহমান

মিষ্টি মেয়ে শবনম
ভালো তোমায় বাসিনি কম
চেয়েছি তুমি মধুর হও
কাজের কথা বেশি কও
জেনেছি তোমার শিল্পী মন
রং- তুলিতে জাগাও পণ
তার আগে চাই পড়াশুনা
খাটুনি চাই বহুগুণা
দলবে যখন পথের কাঁটা
শত্রুর মুখে পড়বে ঝাঁটা
শত্রুর মুখে পড়বে ছায়
দেখবে তখন তোমায় কে পায়
শবনম কী সত্যি মধুর
আবেশে চাই মিষ্টি সুর।

আসলো ঋতুরাজ

আবদুল কুদ্দুস ফরিদী

আসলো রঙিন ফুলের ফাগুন আসলো ঋতুরাজ,
হাকালুকি চলনবিলে রূপের কারুকাজ।
কচি পাতার কিশলয়ে আলোর শিহরন,
ফুলকুঁড়ি আর পাপড়ি পাতার বল্লরিতে
মৌমাছিদের মধুর গুঞ্জরন।
প্রজাপতি দুলে ওঠে ফুলের আঙিনায়,
পরাগ-রেণুর মহুয়া মউ সুরভিতে
ভালো লাগা আনন্দে উছলায়।
পিক-পাপিয়া বুলবুলিদের বসছে ম'ফিল আজ,
নিসর্গ আর প্রকৃতিতে কী অপরূপ সাজ,
আসলো রঙিন ফুলের ফাগুন আসলো ঋতুরাজ।

পরোপকারী

খায়রুল আলম রাজু

ছোটোখাটো প্রদীপের ঝিকিমিকি আলো,
দূর করে ঠেলে দেয় কাছারির কালো!
ঘুটঘুটে রাতে হয় পথিকের সাথি;
যেমনটা বাদলের দিনে লাগে ছাতি।

তবু তার নেই কোনো হিংসে বা দাপ-
একরতি গরিমার তিল হেন তাপ!
এমনি তো ঘটা চাই মানুষের মন,
'পরোপকারী সে যে; খুব সাধারণ'।

দ্বাদশ শ্রেণি, জনাব আলী সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ

চল বন্ধু গ্রামের বাড়ি

কাজী দিনার সুলতানা বিন্তী

দুষ্টু হাওয়ায় মাচান দোলে
মুরগিগুলো যত্ন করে
দেহের তাপে জীবন জাগে
যেমন করে বুনবি ফসল।

বনের বাঘে খায় না পাগল
মনের বাঘকে দিস তাড়িয়ে
রাতটা কাটুক জোছনা-সফেদ
ভোর যে হবে শক্তি নিয়ে
সূর্যস্নানে শুদ্ধ হয়ে
বাংলাদেশটা যাক ছড়িয়ে।

চল বন্ধু গ্রামের বাড়ি
দেখবি কত মায়ায় ভরা
চল বন্ধু আমার বাড়ি
সরষে ক্ষেতে দু'চোখ ডুবাস
বিলের থেকে শাপলা তুলিস
মুড়কি মুড়ি দুধের বাটি।

পরাণ ভরিস ভালোবাসায়
শীতলপাটি দেবো তোকে
নকশিকাঁথার কারুকাজে
আরো দেবো তালের সুধা
বাবুই পাখির মতোই তোকে
মাটির কাছাকাছি থাকিস।

মাটির মানুষ পারলে হতে
বাসবে তোকে সবাই ভালো
মিষ্টি হাওয়ায় মাচান দোলে
মুরগির ছা ভরছে উঠোন
চল বন্ধু গ্রামের বাড়ি
দেখবি কত মায়ায় ভরা

নাচন দেখি শিমের
তা দিয়ে যায় ডিমের।
মনের তাপে মন
তেমনি ফসল-বন।

মনের বাঘে খায়
রাত্রি শুরুর বায়।
নির্ভীক নির্ভয়
দৃপ্ত আলোকময়।
কর্ম করিস ঠিক
বিশ্বের সব দিক।

দেখবি কত সুখ
মা ও মাটির বুক।
হাঁটবি ধানের আলে
দেহ বিলে খালে।
সাদা কিংবা লাল
খেয়ে ভরিস গাল।

আদর সোহাগ মাখা
নকশি তোলা পাখা।
চোখ হবে তোর স্থির
বাবুই পাখির নীড়।
শিখিয়ে দেবো কাজ
নেই তাতে ভাই লাজ।

জিতবি সকল দিক
যখন মানবিক।
শিমের কদর ভারি
দিচ্ছে বিদেশ পাড়ি।
দেখবি কত সুখ
মা ও মাটির বুক।

হিপ হিপ হুররে...

ডিমের জাদু

রাজভীর বসাক জুনিয়র

বাবা জাদু দেখান। আমিও বাবার মতো জাদু দেখাতে জানি। অনেকগুলো জাদুর চালাকি জানি আমি। কিছু কিছু তো আমি নিজেই শিখেছি। আমার বন্ধুদের কাছ থেকে।

একটা জাদু বলি শোনো, একটা ডিমকে হাতে নিয়ে যদি আমি মন্ত্র বলি, তবে ডিমটাকে আমি কাগজের কুচি কুচি টুকরা বানিয়ে দিতে পারি।

আমি যেটা করি, ডিমটা নিয়ে আগে থেকেই ছোটো একটা ছিদ্র করে ডিমের ভেতরটা বের করে ফেলি। এরপর ডিমটাকে রোদে শুকিয়ে নেই।

কাঁচি দিয়ে কাগজকে ছোটো ছোটো করে কাটি। ডিমের ছিদ্র দিয়ে সেগুলোকে ঢুকিয়ে দেই। অন্য একটা সাদা কাগজের ছোটো টুকরা দিয়ে ডিমের ছিদ্রটা বন্ধ করি আঠা দিয়ে।

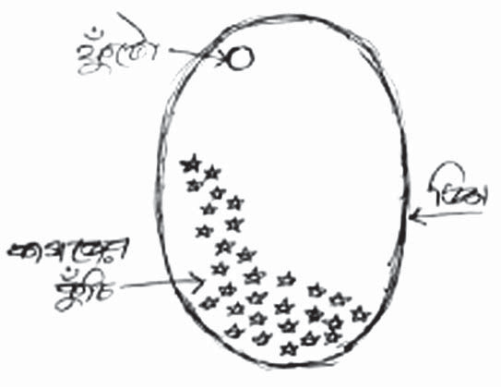

কিছুই বোঝা যায় না তখন। এরপর ঐ ডিমটা দিয়েই আমি জাদু দেখাই। সবার সামনে ডিমটাকে এমনভাবে হাতে নেই যেন ডিমের ছিদ্র না বুঝা যায়। এরপর কথার জাদুতে সবাইকে ভুলিয়ে ডিমটাকে চাপ দিয়ে ভেঙে ফেলি। এমনভাবে ভাঙি যেন কাগজের টুকরোগুলো হাতে থাকে। সবাই ভাবে ডিমটাই কাগজের টুকরো হয়ে গেছে। আর সবাই অবাক হয়ে যায়। ■

দ্বিতীয় শ্রেণি, সেন্ট মেরি'জ স্কুল, চট্টগ্রাম

আমাদের দেশ

মো. আরিফ হোসেন

আমাদের দেশ ঠিক গুণে-মানে সেরা,
ফসলের মাঠঘাট নানারূপে ঘেরা।
সবুজের সমারোহে পাখিদের গান,
রাখালিয়া সুরে সুরে দেয় সদা তান।

মাঝি ভাই তরি নিয়ে গাঙে চলে রোজ,
লগি মেরে করে শুধু ওপারের খোঁজ।
ফুলে ফুলে মধু ছাঁকে ভোমরের দল,
গাছে গাছে থাকে ধরে পাকা পাকা ফল।

ভোর হলে পুব দিকে রবি ওঠে ভেসে,
নিশিথের চাঁদ মামা আলো দেয় হেসে।
এ মাটির বুকে রোজ থাকে সবে বেশ,
বলি যত গুণগান হবে না তো শেষ।

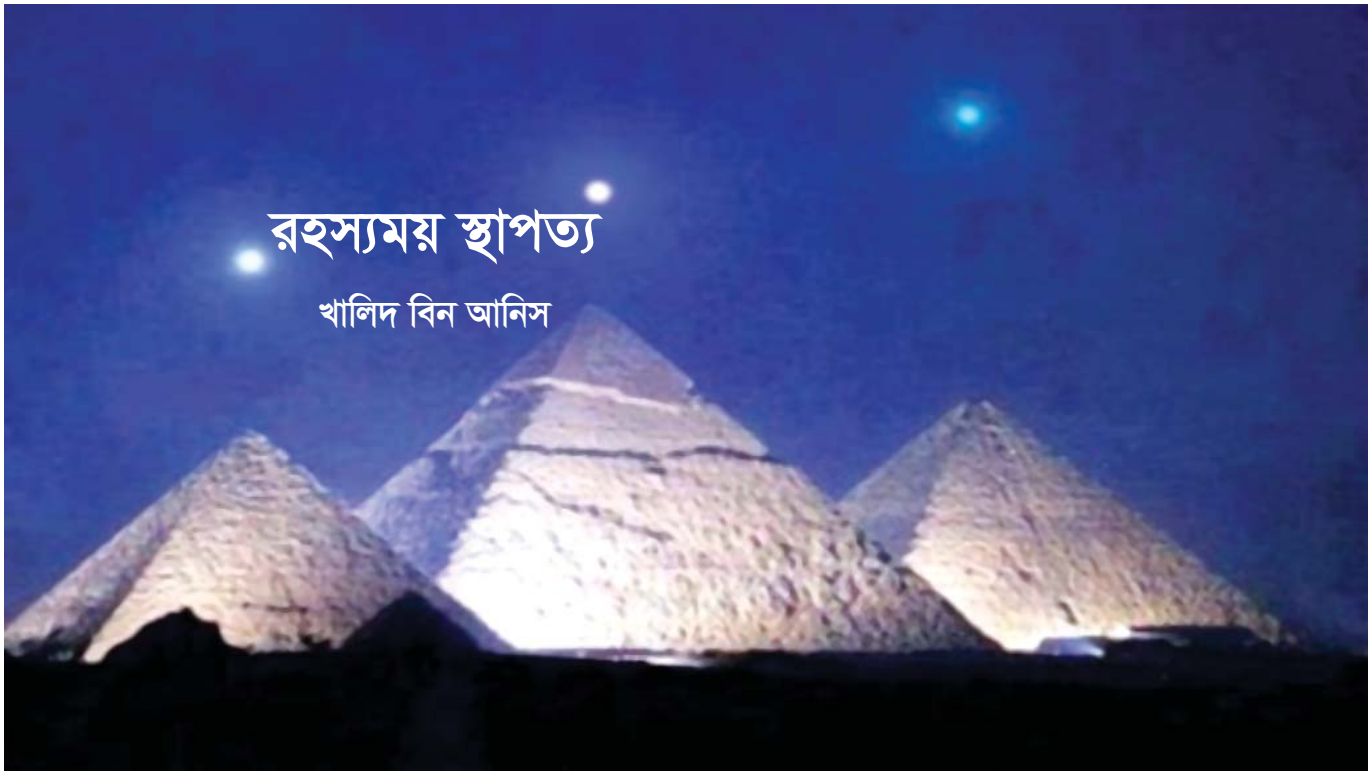

রহস্যময় স্থাপত্য

খালিদ বিন আনিস

মানবজাতির অতীত জানতে ইতিহাসবিদদের চেষ্টার শেষ নেই। প্রাচীন সব স্থাপনা আর লোকমুখে প্রচলিত কাহিনি গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা পাচ্ছেন নতুন নতুন সব তথ্য। তবে হাজার হাজার বছর আগের মানব সভ্যতার অনেক বিষয়ই এখনো মানুষের জানা হয়ে ওঠেনি। সেসব নিয়ে যেমন রহস্য রয়েছে, তেমন রয়েছে নানা উপকথাও। যা রহস্যের মাত্রা শুধু বাড়িয়েছেই!

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এমন কিছু স্থাপনা রয়েছে যা নিয়ে এক পক্ষ দাবি করে যে তা এই পৃথিবীর মানুষের তৈরি নয়! বিজ্ঞানীরা সেসব স্থাপনা ভিনগ্রহীদের নয় দাবি করলেও সেগুলোর নির্মাণ পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনো আঁধারে! এমনই কিছু স্থাপনা নিয়ে ছিল নবারুণের ধারাবাহিক আয়োজন। পড়ো এর শেষ পর্ব।

পিরামিড

মিশরের রাজধানী কায়রো থেকে কিছুটা দূরেই মরুভূমির বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশ্বের বিস্ময় পিরামিডগুলো। আজ থেকে প্রায় ৬ হাজার বছর আগে নীল নদের তীরে গড়ে ওঠা সভ্যতা অনেক উন্নত জ্ঞানের অধিকারী ছিল বলে ইতিহাসবিদেরা বলে থাকেন। তবে সেই জ্ঞানের উচ্চতা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল তারই প্রমাণ বহন করছে এসব আশ্চর্য পিরামিড।

প্রায় সাড়ে ৪ হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে নির্মিত পিরামিড নিয়ে এখনো অন্ধকারে বিজ্ঞানীরা। কোন প্রযুক্তিতে বিশাল পাথরের চাঁই দূরদূরান্ত থেকে টেনে এনে নিখুঁত মাপে কেটে তা একের পর এক সাজিয়ে এমন আশ্চর্য স্থাপত্য তৈরি করা হয়েছিল তা আজও এক রহস্য।

পিরামিড নির্মাণের জন্য অসংখ্য পাথর ব্যবহার করেছিল ফারাও রাজারা। যার একেকটির ওজন কমপক্ষে দুই টন। কিন্তু কোন উপায়ে সেগুলো উপরে উঠিয়ে একের পর এক সাজিয়ে পিরামিড নির্মাণ করা হয় তা এখনো বিজ্ঞানীদের জানা নেই। গবেষণার মাধ্যমে যেসব যুক্তি তারা বের করছেন, পরক্ষণেই তা বাতিলও করে ফেলছেন।

এর চেয়ে বড়ো রহস্য হচ্ছে, এতদিন একে রাজবংশের সমাধিক্ষেত্র হিসেবে মনে করা হলেও বর্তমানে সেই যুক্তি থেকে সরে আসছেন বিজ্ঞানীরা। এই পিরামিড নির্মাণের পেছনে আরো বড়ো ধরনের কোনো উদ্দেশ্য কাজ করেছিল বলে তাদের মনে ক্রমেই বিশ্বাস বাড়ছে।

বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, পিরামিডগুলো যে দূরত্বে স্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে ভৌগোলিক মাপগত রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, এর অবস্থান মহাকাশের একটি বিশেষ দিক নির্দেশও করছে! বিজ্ঞানীরা জেনে অবাক হয়েছেন, খোলা আকাশে দেখতে পাওয়া ওরিয়ন বেল্ট'-এর তারামণ্ডলের বিশেষ তিনটি তারার সঙ্গে মিশরের প্রধান তিনটি পিরামিডের অবস্থানগত মিল রয়েছে।

এছাড়া মিশরে যে অবস্থান বজায় রেখে পিরামিড নির্মাণ করা হয়েছে, এর সঙ্গে পেরুসহ বিশ্বের অনেক স্থানে সন্ধান পাওয়া পিরামিডের মিল রয়েছে। আবার গোটা পৃথিবীতে সন্ধান পাওয়া এমন পিরামিডগুলো একটি রেখায় যুক্ত করলে আশ্চর্য তথ্য বেরিয়ে আসে। তা হচ্ছে, পুরো পৃথিবী যেন পিরামিডের কোনো অদৃশ্য সুতায় বাঁধা রয়েছে।

এলিয়েন বিশ্বাসীরা বলে থাকেন, এই পিরামিড নির্মাণের পেছনে অবশ্যই বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। যে প্রযুক্তি এটি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়, তা ভিনগ্রহের উন্নত প্রাণীদের কাছ থেকে পাওয়া। এর মাধ্যমে মহাকাশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হতো বলেও দাবি তাদের।

আবার কারো কারো দাবি, পৃথিবীর অদৃশ্য কোনো শক্তি জোগাতে এই পিরামিড প্রাচীনকালেই ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান জাতি নির্মাণ করে রাখেন। না জেনে এর ভেতরে প্রবেশ করলে যে ভয়াবহ বিপর্যয় আসতে পারে তা ফারাও যুগেই নানা শিলালিপি এমনকি পিরামিডের প্রবেশদ্বারসহ একাধিক স্থানে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল।

বাস্তবতাও বলছে, পিরামিড রহস্যের পেছনে যারা ছুটেছেন তাদের পরিণতি নিয়ে এখনো নানা রহস্য রয়ে গেছে। যেমন, প্রাচীন মিশরের তুতমসিদ বংশের শেষ বালক সম্রাট তুতেন খামেন'-এর সমাধি আবিষ্কার করে অভিশাপ বাইরে বের করে এনেছিলেন ব্রিটিশ অভিযাত্রী হাওয়ার্ড কার্টার। যার অভিশাপের প্রথম বলি হন অভিযানের অর্থায়ন করা বৃটিশ ধনকুবের লর্ড কার্নার্ভন।

কারো কারো দাবি, কার্টার তুতেন খামেন'র সমাধি আবিষ্কারের পর কার্নার্ভন উদ্‌বোধনের আগেই সেখানে গিয়েছিলেন এবং কিছু দ্রব্য গোপনে সরিয়ে এনেছিলেন। যদিও এই দাবির কোনো বাস্তব ভিত্তি মেলেনি। তবে মিসরের পিরামিডগুলো আজও বিশ্ববাসীর কাছে রহস্য হয়েই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ■

বিশেষ শিশুর সাফল্য

জুবাইর জসীম

রিতিমা তালুকদার। অন্য দশজনের মতো নয় সে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক মনে হলেও সে মোটেই আমাদের মতো নয়। সে বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী। কথা বলতে পারে না। কানেও শোনে না। ইশারা ভাষায় কথা বলে। একমাত্র তার পরিবারই কিছুটা বুঝে তার ভাষা। তাও আবার পুরোপুরি নয়। রিতিমার বাড়ি চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার চেচুরিয়া গ্রামে। রাজিব কুমার তালুকদার ও শিউলি তালুকদারের বড়ো মেয়ে সে। তার তিন বোন। দুই বোন যমজ। এরা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। আরেক বোন ছোটো। তার বাবা পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। মা গৃহিনী। বাক্ প্রতিবন্ধী এই মেয়েটির ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে ওর মা-বাবা খুবই চিন্তিত ছিল।

রিতিমা ২০১৪ সালে জানুয়ারি মাসে স্থানীয় পূর্ব চেচুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। বাক প্রতিবন্ধী হওয়ায় প্রথমে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে নিতে রাজি হননি। কোনো প্রতিবন্ধী স্কুলে তাকে ভর্তির পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু ওর মা নাছোড়বান্দা। কাকুতি মিনতি করতে থাকেন। এদিকে গ্রামে বা মফস্বলে কোনো প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় নেই। আছে জেলা সদরে। সেখানে প্রতিবন্ধী স্কুলে পড়ানোর মতো অবস্থাও তার পরিবারের নেই। অবশেষে মানবিক দিক চিন্তা করে তাকে নেওয়া হয়।

এবার রিতিমার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। কিন্তু তাকে নিয়ে শিক্ষকরা সমস্যায় পড়ে যান। সে শিক্ষকদের কথা বোঝে না শিক্ষকরাও তার কথা বোঝেন না। হাতের ইশারায় হাউমাউ করে কী যেন বলে। তবে বই বা চকবোর্ডের লেখা দেখে দেখে লিখতে ও ছবি আঁকতে পারে। ইশারা ভাষায় রিতিমাকে নিজের নাম, পিতা, মাতা ও ঠিকানা লিখতে বলা হলে সে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে ফেলে। পরীক্ষার সময় সে তার পাশের জনকে অনুসরণ করে খাতায় উত্তর লিখতে পারে। 'রোল কল' করার সময় তাকে বেশ সজাগ দেখা যেত। কার পরে তার নাম ডাকা হয় তা সে খেয়াল রাখত। এভাবে সাড়া দিত সে। নিয়মিত পরিপাটি হয়ে স্কুলে আসত।

প্রত্যেকটি শ্রেণি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এবারের সমাপনী পরীক্ষায় সে জিপিএ- ৩.৫০ পেয়ে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার এ সফলতায় বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন ও শিক্ষকসহ সবাই আনন্দিত।

সে স্থানীয় হাই স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। ভর্তি পরীক্ষায় সে পাঁচশ জনের মধ্যে ১০১তম হয়।

অদম্য স্পৃহা থাকলে জীবনে কোনো বাধাই বাধা মনে হয় না। এর প্রকৃত উদাহরণ রিতিমা। সে প্রতিবন্ধীত্বকে জয় করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে তাকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। কারণ বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে ইশারা ভাষা। কিন্তু এই ইশারা ভাষা জানা লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন।

বর্তমান সরকার এ সকল মানুষদের সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ইশারা ভাষা দিবস পালনের পাশাপাশি অনেক নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে একুশে বইমেলার উদ্‌বোধনী বক্তব্যে ইশারা ভাষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক ভাষা ইন্সটিটিউটে ইশারা ভাষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রবণ প্রতিবন্ধী মানুষের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে বিটিভিসহ সকল টেলিভিশন চ্যানেলের প্রধান সংবাদে ইশারা ভাষা উপস্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এভাবে সরকারের পাশাপাশি সবার সহযোগিতা পেলে রিতিমার মতো দেশের অনেক শিশুই একদিন যোগ্য নাগরিকে পরিণত হবে। ■

বই আলোচনা

ইমরুল ইউসুফ

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম এই মার্চ মাসেই। ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে জন্ম নেওয়া সর্বকালের সেরা এই বিজ্ঞানী সম্বন্ধে জানতে পড়ো দারুণ এই বইটি।

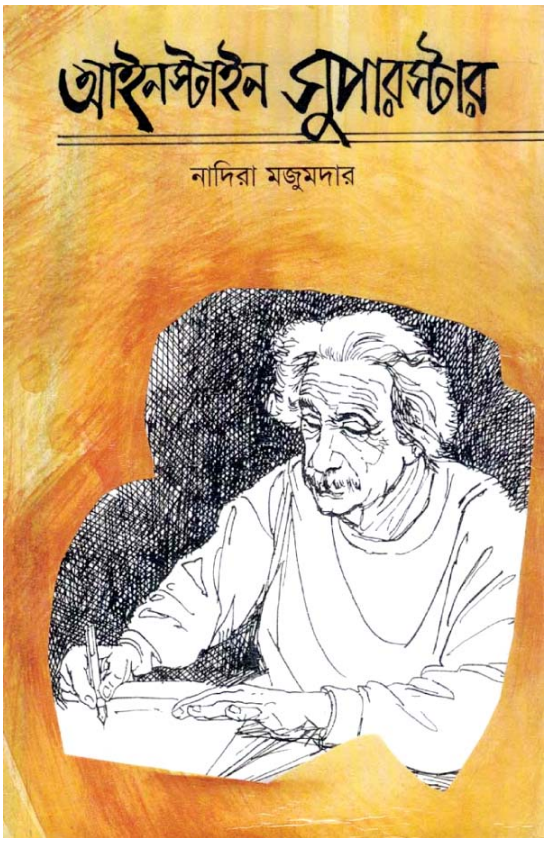

লেখক	:	নাদিরা মজুমদার
বিষয়	:	জীবনী
প্রকাশক	:	বাংলা একাডেমি
প্রকাশকাল	:	জুন ২০১৬
প্রচ্ছদ	:	হাশেম খান
মূল্য	:	১৫০.০০ টাকা

যুগে যুগে পৃথিবীতে জন্ম হয়েছে অনেক বিজ্ঞানীর। যাঁরা আমাদের জীবনকে আরো সহজ করেছেন তাঁদের আবিষ্কারের মাধ্যমে। কিন্তু এই পথ পাড়ি দিতে তাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। তাঁদের চলার পথ মোটেও সহজ ছিল না। কঠোর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁরা সত্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন যুক্তির মাধ্যমে। তাঁদের মধ্যে একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। তিনি একাধারে একজন গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদ। যিনি আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব নিয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

বিশ্বে বুঝি তিনিই একমাত্র বিজ্ঞানী যিনি এত বিপুল সুনাম ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন যে, অনায়াসে পরিণত হন 'সেলিব্রিটি'তে। আর সেলিব্রিটিমাত্রই সুপারস্টার হিসেবে গণ্য হন। সবকিছু মিলিয়ে আইনস্টাইন তাই সুপারস্টার বিজ্ঞানী। আর এই বিজ্ঞানীর জীবন গবেষণাকর্ম তারকাখ্যাতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ছোটো বড়ো সবার প্রিয় লেখক নাদিরা মজুমদার একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম *আইনস্টাইন সুপারস্টার*।

আলবার্ট আইনস্টাইনের অসাধারণ আবিষ্কারের মতো তাঁর কয়েকটি কথা আমাদের ভীষণ মুগ্ধ করে। যেমন– তিনি প্রায়ই বলতেন, আমার কোনো অসাধারণ গুণ নেই। আমি কেবলমাত্র আমার কৌতূহলকে অনুসরণ করি। আমি খুব বুদ্ধিমান নই। তবে আমি আমার সমস্যাটির সাথে বেশি সময় নিয়ে থাকতে পছন্দ করি। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি কখনো ভুল করেনি, সে আসলে নতুন কিছু করার চেষ্টাই করেনি। বলতেন, সফলতার পেছনে ছোটার কোনো দরকার নেই। তার চাইতে বরং সম্মান রাখার জন্য ছোটা উচিত। তিনি আরো বলতেন, কল্পনা জ্ঞানের চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কল্পনার মাঝেই রয়েছে সবকিছু।

সত্যিই তো–আমাদের কল্পনার মাঝেই নিহিত থাকে সবকিছু। কল্পনা থেকে যখন কোনো কিছু সৃষ্টির চেষ্টা হয়, তখন সেই সৃষ্ট জিনিসটিই হয়ে যায় আবিষ্কার। কাজটি কিন্তু মোটেও সহজ নয়। আইনস্টাইন আবিষ্কারের বিষয়ে যে কতটা মোহগ্রস্থ থাকতেন সে বিষয়ে লেখক এই বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন– পরবর্তীকালে আলবার্ট লেখেন: আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, বিশেষ 'আপেক্ষিক তত্ত্বের বীজ যখন আমার ভেতরে ক্রমশ অঙ্কুরিত হচ্ছিল, আমি সব ধরনের স্নায়বিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের শিকার হই। কম

বয়সে আমি প্রায়শই কয়েক সপ্তাহ মেয়াদি একধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পর্যায়ে থাকতাম। এর ফলে যে হতচেতন অবস্থায় চলে আসতাম তা কাটাতে আমার কয়েক সপ্তাহ তো লাগতই।' আলবার্টের জন্যে এই আপাত অসহ্য অসম্ভব অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার, একমাত্র ওষুধ ছিল 'বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বে'র সমাধানে আসা...!'

আপেক্ষিক সূত্রটি সহজভাবে বোঝাতে লেখক বইয়ের আরেক জায়গায় লিখেছেন '...জাহাজের কোনো লক্ষণ বা ফলাফল থেকে যেমন হলফ করে বলা যায় না–জাহাজটি সুষমভাবে চলছে নাকি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অনেকটা সে রকম আর কি! আসলেও 'জাহাজের কেবিনের ভেতরে শুয়ে বসে থাকলে, বোঝার উপায় নেই–জাহাজটি চলছে নাকি স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে।' আর এটাই হলো আপেক্ষিক সূত্র। সে আমিই বা অন্য কেউ যে-ই হোক, বাইরের দিকে না তাকিয়ে হলফ করে বলাই যায় না আসলে সুষমগতিতে চলছি কিনা।

আইনস্টাইন সুপারস্টার বইয়ে লেখক নাদিরা মজুমদার আইনস্টাইনের জীবন এবং আবিষ্কারের গল্প বলতে গিয়ে আরো অনেক বিজ্ঞানীর কথা বলেছেন। তাঁদের আবিষ্কারের কথা বলেছেন। আবিষ্কার নিয়ে মজার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এদের মধ্যে আছেন–গ্যালিলি গ্যালিলিয়ো, মাইকেল ফ্যারাডে, আইজ্যাক নিউটন, ম্যাক্সওয়েল, হেনড্রিক লরেনৎস, রোমার, ব্র্যাডলি, ক্রিশ্চিয়ান অয়েরস্টেড, লুইজি গ্যালভানি, আলেসান্দ্রো ভোল্টা প্রমুখ। গ্যালিলিয়োর কথা উদ্ধৃত করে এই বইয়ের লেখক এক জায়গায় লিখেছেন–'সমুদ্রযাত্রা ও পার্থিব যে-কোনো ব্যাপারে ব্যবহারের জন্যে আমি যে টেলিস্কোপটি বানিয়েছি, তার মূল্য সীমাহীন! এর ফলে, শত্রু টের পাওয়ার অন্তত দুই ঘণ্টা কি আরো বেশি আগেই শত্রু জাহাজ ও নৌবহর প্রথানুগ সময়ের পূর্বেই ধরা পড়ে যাবে। ফলে, শত্রুবলের গুণাবলি ভিত্তিতে হয় তাকে ধাওয়া করা যাবে নয়তো চটপট সরে পড়া সম্ভব হবে...।'

লেখক এই বইয়ে আইনস্টাইনের জীবন ও আবিষ্কারের কথা বলার পাশাপাশি আলবার্টের দুর্লভ কিছু ছবি দিয়েছেন। যেমন– হাই স্কুলে পড়ার সময় আইনস্টাইন কেমন ছিলেন, পলিটেকনিকে পড়ার সময় স্ত্রীর সঙ্গে সাইকেল আরোহী নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর আইনস্টাইন, চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে আইনস্টাইন প্রভৃতি।

বিশ্বখ্যাত এই সুপারস্টার বিজ্ঞানী যে কতটা সহজ সরল ছিলেন তার একটি গল্প বলে লেখাটি শেষ করব। তিনি প্রায়ই বিভিন্ন সভা সেমিনারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর উদ্ভাবিত আপেক্ষিক তত্ত্বটি বোঝাতে লেকচার দিতে যেতেন। প্রায় সব সেমিনারে তিনি একই ধরনের আলোচনা করতেন।

একবার এমনি এক সেমিনারে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন লেকচার দেবার জন্য। পথে তাঁর ড্রাইভার তাঁকে আজব এক আবদার করে বসলো। বলল, 'স্যার, আপনার লেকচারগুলো শুনতে শুনতে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। আজ একদিনের জন্য আমি আইনস্টাইন সেজে সেমিনারে বক্তব্য দিতে চাই।' মজার মানুষ আইনস্টাইনের এই কথাটা খুব মনে ধরল। তিনি এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। দেখাই যাক না, ব্যাপারটা কী হয়? তো, ড্রাইভার আইনস্টাইন সেজে অনুষ্ঠানে গেল বক্তব্য দিতে। আর আইনস্টাইন দর্শক সারিতে বসে রইলেন আইনস্টাইনেরই ড্রাইভার হয়ে। তখন তো আর মিডিয়ার এত প্রভাব ছিল না। তাই ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারল না। আইনস্টাইনরূপী ড্রাইভার মঞ্চে চমৎকার বক্তব্য রাখল। দর্শক সারিতে বসে মুগ্ধ আইনস্টাইন বার বার হাততালি দিতে লাগলেন। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত একজন আইনস্টাইনের ড্রাইভারের কাছে যেয়ে বললেন, 'আপনার বক্তব্যটি আমার খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু কি জানেন, আমি এই এই বিষয়গুলো ঠিক বুঝতে পারিনি। আপনি কি অনুগ্রহ করে আমাকে বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেবেন?' আইনস্টাইনের ড্রাইভার বিন্দুমাত্র দেরি না করে উত্তর দিল, 'ওহ! এই ব্যাপার? এই ব্যাপারটা তো আমার ড্রাইভারই বুঝিয়ে দিতে পারবে। চলুন তার কাছেই যাই।' ড্রাইভার সেজে থাকা আইনস্টাইন তখন তাকে বিষয়টি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন।

ওই দর্শকের মতো তোমরাও যদি আইনস্টাইনের আবিষ্কারের কথা জানতে চাও, আইনস্টাইনের জীবন সম্পর্কে জানতে চাও, সকল বিজ্ঞানীর মধ্যে আইনস্টাইন কেন সুপারস্টার সে বিষয়টি জানতে চাও তাহলে এই বইটি পড়তে পারো। আশা করি সকলের ভালো লাগবে। ■

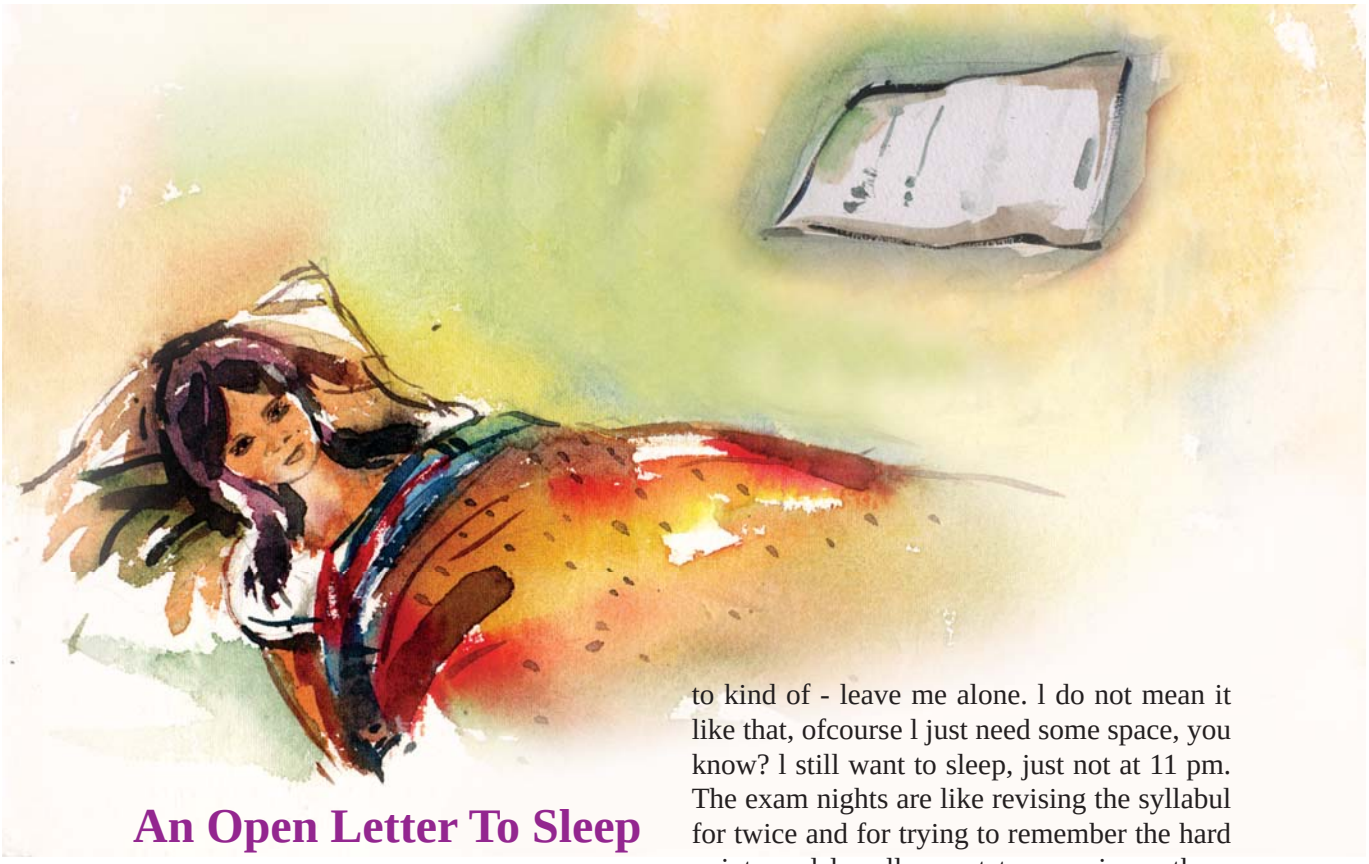

An Open Letter To Sleep

Kazi Miftahul Jannat

Dear Sleep,

Do you remember the last time you came on time? Me neither. I think it is a very random and useless game of ignoring each other that we play when we both know how much we need each other. You like to ignore me when I am Iying in my bed in the dead of the night, staring at the ceiling fan and I tend to ignore yon when I am in the class room or at the time of studing and trying to get an education.

See, the thing is, You are probably confused. Do not worry, I am not blaming you. l know it is me, l keep confusing you. what l am trying to tell you is that during the weekends and specially from this year l really need to sleep early (not so early) and have to wake early because the devil has created an exam namely SSC which fortunately and unfortunately l have to attend So, l need you to co-operate with me.

When it is the exam time, however l need you to kind of - leave me alone. l do not mean it like that, ofcourse l just need some space, you know? l still want to sleep, just not at 11 pm. The exam nights are like revising the syllabul for twice and for trying to remember the hard points and l really want to experience them without feeling the heaviness on my eye lids and the tiredness in my bone.

I just do not understand why in the middle of night when l am finally drifting through the different stages of my sleep cycle quite peacefully a random snooring of my father makes you fly away in an instant. Then l am left with listening to the weird sounds of the dark and silent night. Trust me, l spend an unhealthy amount of time wondering what the hell on world is happening? Your exclusive nature has also left me pondering with my mom that l really was awake the whole night sleeples but she refuse my opinion. You probably do not understand this when you do not grace my life with your presence l am left thinking about the most cringe inducing moments in my life. All complains aside, l have to tell you that from now on, l will make no more excuses and neither will you. You and l together will be the best of friends that care about each other needs. Deal? ■

Class-Nine, Viqarunnisa noon school, Dhaka

গল্প

পদ্ম ডিঙ্গি

মিনা মাশরাফী

কুসুম আর কলি দুই বোন, খুব লক্ষ্মী দু'টি মেয়ে। তাদের বাবা-মা ওদের খুব আদর করে। গ্রামের হাটের পাশে সরু মেঠো পথের ধারে ছোট্ট ছনের কুটির। বাবা আর মায়ের সাথে কুসুম আর কলি বাস করে গ্রামের সুন্দর আলোছায়া ঘেরা সেই ছোট্ট কুটিরে। গ্রামের নাম মধুমতি। কুসুম-কলির বাবা কৃষক। মা গৃহস্থালির কাজ করেন নিজের বাড়িতেই। ঘরের চালের কোনায় কবুতর বাকবাকুম সুরে সুরে সারাদিন গান গায়। ছোট্ট নিকানো উঠোনে মুরগি ছানা মা মুরগির পাখার তলে তলে লুটোপুটি করে উষ্ণ আদর নিতে নিতে ছোট্ট ঠোঁটে খুঁটে খুঁটে আহার খায়। কুসুম-কলি মায়ের কাজে সাহায্য করে। স্কুলে যাবার সময় হলে বই খাতা ব্যাগে পুরে স্কুলে যায়। স্কুল থেকে ফিরে দু'বোন গ্রামের বনে বনে নানারকম ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথে, ফল-ফলারি খায়। ওদের কুটিরের পিছনে লাউ আর শিমের জাংলা ফুলে ফুলে ভরা।

মধুমতি গ্রামের পাশ দিয়ে নদী কুল কুল করে বয়ে চলেছে। নদীর পানি স্বচ্ছ। কুসুমের বাবা ঐ নদী থেকে প্রায়ই মাছ ধরে নিয়ে এসে হাটে বিক্রি করে সওদা আনে। একদিন কুসুম-কলি বাবার সাথে নদীতে মাছ ধরতে গেল। নদীর ধারে কাশফুল শিরশির বাতাসে দোল খাচ্ছে। মাঝি নৌকার দাঁড় বাইতে বাইতে গান গাইছে, কী যে মধুর দৃশ্য। দু'বোনের এই মনোরম দৃশ্য দেখে আনন্দে ভরে উঠল মন। ওরা দুই বোন নদীর তীরে বালুর উপর লাফিয়ে লাফিয়ে বেনি দুলিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। পায়ের উপর বালি চাপা দিয়ে বালির ঘর বানাল, ঘাস ফুল, কাশফুল দিয়ে সাজাল। খুবই মজা করছিল দু'জনে, বাবার ডাকে ছুটে গেল বাবার কাছে। জালে আটকা পড়েছে অনেক রূপালি মাছ, বিকেলের মিষ্টি রোদে চিকচিক করছে। ওদের বাবা জাল উঁচিয়ে ডাঙায় নিয়ে ঝাড়তে লাগল। মাছের লাফালাফি দেখে ওরা পটাপট মাছ তুলে তুলে খোলইর ভিতর জমা করতে লাগল। মাছ কুড়াতে কুড়াতে প্রায় বেলা গড়িয়ে এল। বাবা বললেন, কুসুম-কলি তোমরা জাল নিয়ে বাসায় চলে যেও, আমি মাছ বিক্রি করতে হাটে যাই। কুসুমের হাতের কাছে কিছু মাছ রেখে গেলাম, বাসায় নিয়ে মাকে দিবে। এই কথা বলে বাবা হাটের দিকে রওয়ানা হলেন।

তাসনিয়া আফ্‌ফান মুনতাহা (নীলাঞ্জনা)
অষ্টম শ্রেণি, রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল

জাল গুছাতে গুছাতে প্রায় সন্ধ্যার আকাশ লাল হয়ে এল। হঠাৎ দেখে নদীর মাঝখান থেকে আলো ছিটকে আসছে। কুসুম-কলি একটু চমকে উঠে তাকিয়ে দেখে, নদীর মাঝখানে কী!

রূপসি দুইটি মেয়ে মৎসকুমারী আর জলপরি। একজনের পা নেই, আছে মাছের মতো শরীর। আর একজনের দুইটি ডানা ভারি চমৎকার, খুবই মিষ্টি সুন্দর চেহারা, গালগুলো ওদের গোলাপের পাপড়ির মতো গোলাপি, চুলগুলো মেঘের মতো বিছানো, যেন নরম তুলতুলে। একজন হলুদ আর একজন লাল ফুরফুরে ফোলা ফোলা জামা পরেছে। পাতলা পাতলা লাল ঠোঁট, মিষ্টি হাসিতে ভরা মুক্তোর মতো দাঁত। কুসুম-কলির মন খুশিতে নেচে উঠল, একটুও ভয় লাগছে না, পা পা করে ওদের ওদিকেই একটু করে এগুতে যায়। কিন্তু হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে চোখে-মুখে বালি ছিটিয়ে দিয়ে গেল যেন, দুহাতে চোখ কচলাতে কচলাতে দেখল মৎসকন্যা আর জলপরি বিশাল একটা পদ্মফুলের ডিঙ্গি নায়ের মাঝখানে বসে আছে। পদ্মফুল ভেসে যাচ্ছে নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে-ওরা দেখতে থাকে সেদিকে। দু'জনের চোখে-মুখে আনন্দ উচ্ছল আলোর ঝলকানি। সন্ধ্যার আঁধার পথঘাট ছেয়ে নিচ্ছে। কুসুম-কলি তাড়াতাড়ি মাছগুলো জালের এক কোণায় বেঁধে নিয়ে ভারী জাল দু'জনে ধরাধরি করে বাসার দিকে ফিরছে। হাঁস-মুরগি ঘরে তুলে রেখে মা কুসুম-কলিকে নিতে এদিকেই এগিয়ে আসছেন। কুসুম-কলি জাল আর মাছ নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে মায়ের কাছে এগিয়ে এল। মা ওদের হাত থেকে ভারী জাল আর মাছের খোলই হাতে নিলেন। কুসুম-কলি মৎসকন্যা আর জলপরির কথা মাকে বলতে বলতে ওদের ছোট্ট কুটিরে পৌঁছে গেল। মা ওদেরকে হাত-মুখ ধুয়ে ছোট্ট বারান্দায় মাদুর পেতে বসতে বললেন। ওরা দু'বোনে লক্ষ্মী মেয়ের মতো হাত-মুখ ধুয়ে মুছে বারান্দায় প্রদীপ জ্বেলে বই পড়তে বসে গেল। মা ওদের দু'জনের সামনে উড়কি ধানের খই, মুড়ির নাড়ু আর ঠান্ডা পানি খেতে দিলেন। খাওয়া শেষে দু'জনে পড়তে লাগল। বাবা হাট থেকে চাল, ডাল, তেল কিনে বাসায় ফিরলেন। কুসুম-কলি খুব খুশি হয়ে বাবাকে মৎসকন্যা আর জলপরির গল্প বলল এবং বায়না ধরল আগামীকালও তারা বাবার সাথে মাছ ধরতে যাবে। বাবা বললেন, তোমরা ছোটো মানুষ, রোজ নদীতে যাওয়া ঠিক নয়। মাঝ নদীতে অনেক গভীর পানি। হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বাবা-মা'র চোখের মনি আদরের ধন কুসুম-কলি। মা উনুন ধরিয়ে দিলেন কাঠখড়ি দিয়ে, জাংলার লাউ আর মাছ, ভাত রান্না করে খাওয়ার জন্য বাড়লেন। সবাই একসাথে তৃপ্তির সাথে খেয়ে রাতে শুয়ে পড়ল ছোটো কুটিরে। ওদের ছোটো কুটির বড়ো শান্তির নীড়। সবাই মিলে খেটে খায়। তাই কষ্ট হয় না তেমন। বাবা-মায়ের কাজে কুসুম-কলিও সবসময় সাহায্য করে।

ভোর বেলা পাখির ডাকে, আজানের সুরে ঘুম ভাঙে মা'র। মা-বাবা বিছানা ছেড়ে উঠে অজু করে নামাজ পড়েন। মা উঠানে খাবার ছিটিয়ে দিয়ে কবুতর, হাঁস মুরগির খোপের দুয়ার খুলে দিলেন। কলকাকলিতে ভরে উঠল উঠান। দেখতে ভারি সুন্দর লাগছে। কুসুম-কলি পদ্মফুলের ডিঙ্গিতে চড়ে জলে ভেসে বেড়াচ্ছে জলপরি আর মৎসকন্যার সাথে। জলপরি আর মৎসকন্যা ওদের নিয়ে যাচ্ছে অন্য দূরদেশে। এক ঘাটে এসে ভিড়ল পদ্মডিঙ্গি। চারিদিকে ফুলে ফুলে রঙিন, তুলার মতো মেঘগুলি বাতাসের দোলায় গায়ে আদর বুলিয়ে যাচ্ছে। স্বচ্ছ পানিতে রঙিন নুড়ি, রং-বেরঙের ছোটো-বড়ো মাছ। জলপরি ওদের হাত ধরে নেচে নেচে ফুল বাগানে গেল। সেখানে কত পাখি নাম না জানা। ফুল আর ফুল, আর পাখির কলতান। তারপর ওরা ফল বাগানে গেল। পাকা পাকা ডাসা ডাসা কত রকমের ফল, ওরা খুশিতে বাকবাকুম। মা জলপরি ওদের যত্ন করে রুপোর থালায় ফল-ফলারি খেতে দিল। দু'জনে খুব মজা করে খাচ্ছে। এদিকে মৎসকন্যা অনেক মনি, মুক্তা, হীরা, পান্নার মালা নিয়ে হাজির। মালাগুলোতে যেন রাজ্যের আলো ঝলকাচ্ছে। কুসুম-কলি নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে ওদের গায়ে দামি সুন্দর ফুলপরিদের জামা। অবাক বিস্ময়ে আনন্দে উৎফুল্ল ওরা, খিলখিল হাসিতে আত্মহারা। মায়ের ডাকে স্বপ্ন ভেঙে গেল। মা বললেন, কত বেলা হয়েছে এখনো উঠছ না যে। কুসুমের পায়ে এক ফালি রোদের ঝিলিক। কুসুম বুঝতে পারে আসলে অনেক বেলা হয়েছে। চটপট উঠে পড়ে আজ ওরা সকালে মায়ের কাজে সাহায্য করতে পারল না। ভাবল আজ বাবার সাথে নদীতে গেলে স্বপ্নটা যদি সত্যি হয় কী মজা হবে। ■

টিয়ের বন্ধু কে?

অনুবাদঃ নাবীল অনুসূর্য

অনেক অনেক দিন আগে জাপানের এক গ্রামে এক বুড়ো আর এক বুড়ি বাস করত। বুড়োটা ছিল যেমন ভালো, বুড়িটা ছিল তেমনই বজ্জাত। বুড়োটার একটা পোষা টিয়া ছিল। পাখিটাকে যে সে কী ভালোবাসত! কিন্তু পাখিটার প্রতি বুড়ির একটুও ভালোবাসা ছিল না।

একদিন হলো কী, বুড়ো তখন বাড়ির বাইরে। বুড়ি ওর লিনেনের কাপড়ে মাড় হিসেবে দেওয়ার জন্য কীসের একটা মণ্ড তৈরি করেছে। টিয়া পাখি তো আর এত কিছু বোঝে না। ও গিয়ে সেই মণ্ডটা ঠোকরাতে শুরু করল। তাই দেখে বুড়ি তো রেগে আগুন। সে করল কী, পাখিটাকে সোজা বাড়ি থেকে বের করে দিল।

বুড়ো তো বাড়ি এসে দেখে, ওর সাধের টিয়া পাখিটা নেই। সারা বাড়ি খুঁজেও আর ওকে পায় না। এ তো আর বনের পাখি না যে খাঁচা খোলা পেয়ে উড়ে পালিয়ে যাবে। ওর ভালোবাসার পোষা পাখি। শেষে বউকে জিজ্ঞেস করল।

তখন বুড়ি বলল, পাখিটা তার মাড়ের মণ্ড ঠুকরিয়ে কী বজ্জাতিটাই না করেছে! আর তার শাস্তি হিসেবে সে পাখিটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

এই নিষ্ঠুর ঘটনা শুনে বুড়ো তো ভীষণ মুষড়ে পড়ল। আহা, ওর এত প্রিয় পাখিটাকে ও এভাবে হারিয়ে ফেলল! বেচারা পাখিটা! একা একা কোথায় গেছে? ওর বাসা এখন কোথায়?

'ও পাখি! টিয়া পাখি! তুমি কোথায়?' বলে বলে বুড়ো আশেপাশের সব জায়গায় খুঁজে বেড়ালো। আশেপাশের বনেজঙ্গলে-বাগানে। কিন্তু কোথাও পেল না।

খুঁজতে খুঁজতে বুড়ো একটা পাহাড়ের গোড়ায় গিয়ে পৌঁছাল। সেখানে গিয়ে অবশেষে সে তার সেই টিয়ে পাখির দেখা পেল। বুড়ো তো ভেবেছিল, এই জীবনে বুঝি ও আর ওর পোষা টিয়েটার দেখা পাবে না। টিয়েটাও তেমনটাই ভেবেছিল। তারপর যখন দুজনে দুজনার দেখা পেল, দুজনেই একদম আহ্লাদে গদগদ হয়ে গেল।

টিয়েটা বুড়োকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। ওর স্ত্রী-সন্তানদের সাথে বুড়োর আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর টিয়ে দম্পতি বুড়োর কী খাতিরটাই না করল! যত রকমের সুস্বাদু খাবার বুড়োর সামনে সাজিয়ে দিল। যত রাজ্যের আপ্যায়ন করা যায়, সব ওকে করল।

এমন খাতির-যত্ন পেলে কি আর চট করে সেখান থেকে চলে আসা যায়! আর টিয়েটাও নাছোড়বান্দা, বুড়োকে সহজে ছাড়বেই না। প্রতিদিন সে বুড়োর জন্য রীতিমতো রাজকীয় ভোজের বন্দোবস্ত করে যাচ্ছে। কিন্তু টিয়ের ঘাড়ে নিজের রাজকীয় ভোজের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে তো আর দিনের পর দিন বসে বসে খাওয়া চলে না। কিছুদিন পরে বুড়ো তাই একরকম জোর করেই বাড়ির পথ ধরল।

বুড়োকে কোনোভাবেই থামাতে না পেরে টিয়ে

আরেকটা কাজ করল। দুটো ঝুড়ি ভর্তি করে বুড়োকে উপহার দিল। একটা ঝুড়ি অনেক ভারী, আরেকটা বেশ হালকা। তখন বুড়ো বলল, 'আমি বুড়ো দুর্বল মানুষ, দুটো ঝুড়ি তো আমি বয়ে নিতে পারব না। এই ঝুড়িটা অনেক ভারি, এটা না হয় থাকুক। আমি এই হালকা ঝুড়িটাই কেবল নিয়ে যাই।'

এই বলে বুড়ো কেবল হালকা ঝুড়িটা নিয়েই বাড়ির পথে রওয়ানা হলো। টিয়ে পাখি আর তার পরিবার বুড়ো চলে যাওয়ায় ভীষণ মন খারাপ করে রইল।

ওদিকে বুড়ি তো বাড়িতে অগ্নিশর্মা হয়ে অপেক্ষা করছিল। বুড়ো ফিরতেই একদম তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল, 'বলি, কোথায় ছিলে এতদিন, হ্যাঁ? টিয়ে পাখিটার খোঁজে গিয়েছিলে, না? কী সুন্দর কথা! সারাটা জীবন কি ওই টিয়েটার খোঁজে ছোটাছুটি করেই কাটিয়ে দেবে নাকি?'

'হ্যাঁ, টিয়ের খোঁজেই গিয়েছিলাম', বলল বুড়ো, 'টিয়ের সাথে দেখাও হয়েছে। ওর বাড়িতেই বেড়াতে গিয়েছিলাম। আর দেখো না, আসার সময় আবার আমাকে এই ঝুড়ি ভর্তি উপহারও দিয়েছে। আরেকটা ঝুড়িও দিয়েছিল। কিন্তু সেটা অনেক ভারি, তাই ওটা আর নিয়ে আসিনি।'

শুনে বুড়ি উলটো মুখ বাঁকাল। যেই না একটা পাখি, সে আবার নাকি ঝুড়ি ভর্তি করে উপহারও দেয়। কিন্তু ঝুড়িটা খোলার পর বুড়ির ভাবভঙ্গি কিন্তু পুরোই বদলে গেল। রাগারাগি বাদ দিয়ে সে খুশিতে বাকবাকুম করে উঠল। না করে যে উপায়ও নেই। ঝুড়ি ভর্তি সোনা, রুপা আরো সব দামি দামি জিনিসপত্র!

বুড়িটা ছিল যেমন বজ্জাত, তেমনি লোভী। বুড়ো তো একটা বোকা, দুটো ঝুড়ি না আনতে পারুক, অন্তত ভারী ঝুড়িটা তো নিয়ে আসবে। তাহলে সোনা-রুপা আরো কত বেশি বেশি পাওয়া যেত!

বুড়ি ঠিক করল, এবার সে নিজেই যাবে। টিয়াটার সাথে দেখা করবে। সে ঠিকই ভারি ঝুড়িটা নিয়ে আসবে। যত কষ্টই হোক। বুড়োর কাছ থেকে ঠিকমতো পথের দিক-নির্দেশনা নিয়ে নিল বুড়ি। তারপর সে নিজেই রওয়ানা হলো টিয়ের বাড়ির পথে।

বুড়োর কথামতো চলতে চলতে এক সময় টিয়ের সাথে ওর দেখাও হয়ে গেল। আগে যে টিয়েকে দেখলেই বুড়ি খেঁকিয়ে উঠত, এবার সেই টিয়েকে দেখেই ওর মুখ দিয়ে মধু ঝরতে লাগল, 'কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! আমি তো তোমার সাথে দেখা করতেই যাচ্ছিলাম। কতদিন পর তোমাকে দেখলাম। কী সৌভাগ্য, তোমার সাথে আবার আমার দেখা হয়ে গেল।'

এমনি সব মধু-ঝরানো মন-ভুলানো কথা বলে বলে টিয়েটার মন গলাতে চেষ্টা করতে লাগল বুড়ি। বলতেই থাকল, বলতেই থাকল। শেষে টিয়ে দেখল, আর তো কোনো উপায় নেই। সে বুড়িকে দাওয়াত করে বাড়িতে নিয়ে গেল। কিন্তু কোথায় বুড়োকে দেওয়া রাজকীয় ভোজ, আর কোথায় বুড়িকে দেওয়া খুদ-কুঁড়ো। উপহারের কথা তো ভুল করেও তুলল না।

কিন্তু বুড়ি তো এসেছে স্রেফ উপহারের লোভেই। সে তো উপহার না নিয়ে যাবেই না। যখন দেখল, টিয়েটা উপহারের কথা কিছু বলছেই না, সে নিজে থেকেই বলে উঠল, 'আমাকে কিছু একটা উপহার দেবে নাকি, ঝুড়িটুরি কিছু একটা। আমাদের এই দেখা হওয়ার একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে সেটা।'

টিয়েটা বুড়ির মনের কথা ঠিকই বুঝতে পারল। সে আগের বারের মতোই দুটো ঝুড়ি নিয়ে আসলো। একটা হালকা, একটা ভারি। বুড়িটা যে লোভী, সে যে ভারিটাই নিবে, সে কি আর বলার অপেক্ষা রাখে। তারপর বুড়ি ভারি ঝুড়িটা নিয়ে রওয়ানা দিল বাড়ির পথে।

কিন্তু বাড়ি পর্যন্ত আর বুড়ির আসা লাগল না। কৌতূহলের আতিশয্যে তার আগেই বুড়ি ঝুড়িটা খুলে ফেলল। আর খুলে দেখে কী, কোথায় সোনা আর কোথায় রুপা! রাজ্যের যত দুষ্টু আর মন্দ ভূত-প্রেত-বামন-কুঁজোতে ঝুড়ি ভর্তি। ঝুড়ি খুলতেই ওরা সবাই তড়াক করে বেরিয়ে পড়ল। বুড়ি আর বাড়িতে ফিরবে কী, ওদের যন্ত্রণায় তার প্রাণ বাঁচানোই দায় হয়ে পড়ল।

ওদিকে বুড়োর কিন্তু দিনকাল খারাপ কাটছে না। ওর তো আর বেশি পাওয়ার লোভ নেই। টিয়ের দেওয়া উপহারের কল্যাণে এমনিতেই ওর কপাল খুলে গেছে। তাই দিয়ে ওর ভালোমতোই চলে যাচ্ছে। একটা ছেলেকেও ও দত্তক নিয়েছে। বুড়ো-বাচ্চাতে মিলে বেশ আনন্দেই কেটে যাচ্ছে দুজনের দিন। ■

বন্ধুদের জন্য মজার খবর

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বন্ধুরা তোমাদের জন্য এবার নিয়ে এলাম নানারকম খবর। আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে নানারকম ঘটনা। এই ঘটনাগুলোতে আমরা কখনো হই অবাক, কখনো গর্বিত, রোমাঞ্চিত অথবা আনন্দিত। এসো জেনে নেই এরকম কিছু খবর।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর-এর পোস্টার, ক্যালেন্ডার: ২০১৯ সালে ডিএফপি প্রকাশ করেছে ক্যালেন্ডার, ডেস্ক ক্যালেন্ডার এবং ফোল্ডার। এছাড়া প্রতি বছরই বিশেষ দিবস উপলক্ষে পোস্টার ছাপানো হয়। এ বছর শিশুদের জন্য আলাদাভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারির পোস্টার করা হয়েছে।

পুরস্কার হিসেবে নবারুণ

নবারুণ শিশু-কিশোরদের অনেক জনপ্রিয় একটি পত্রিকা। নাটোরের শুকলাল ভিটা, রঘুনাথপুরের গ্রামে

শিশু-কিশোরদের খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। আর খেলা শেষে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় নবারুণ পত্রিকা। নবারুণ পেয়ে শিশু-কিশোররাও আনন্দিত আর আমরাও গর্বিত।

শাপলার নকশাকার মোহাম্মদ ইদ্রিস চিরনিদ্রায় শায়িত

জাতীয় প্রতীক শাপলার নকশাকার শিল্পী মোহাম্মদ ইদ্রিস চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন। ২২শে ডিসেম্বর তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬১ সালের রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান আয়োজন ও ছায়ানটের প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছেন।

৪৯ এবং ১২০ দিনে কোরানের হাফেজ

মাত্র ৪৯ দিনে কোরানের হাফেজ হয়েছে ৯ বছরের শিশু রাফসান। কুমিল্লা শহরের ইবনে তাইমিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের হিফজ বিভাগ থেকে সে এ কীর্তি গড়েছে। তেমনি ১২০ দিনে কোরান শরিফ মুখস্ত করে হাফেজ হয়েছে ৯ বছরের এতিম শিশু আব্দুর রহিম। কক্সবাজার খানকায়ে হামেদিয়া এতিমখানা ও হেফজ খানার ছাত্র সে।

দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তির

বাহান্ন বছর বয়সেও শিক্ষার আশা ছাড়েননি শফিকুল ইসলাম। গত ২রা ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এসএসসি, সমমান ও দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন এই ব্যক্তি। তার পরীক্ষা কেন্দ্র বগুড়ার শেরপুরে শালফা টেকনিক্যাল অ্যান্ড বি.এম কলেজ।

৯০ হাজার প্রতিবন্ধী মাসিক শিক্ষা উপবৃত্তি পাচ্ছে

সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের শিক্ষালাভের সহায়তা হিসেবে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করেছে। শিক্ষাজীবন শেষে বিশেষ সুবিধায় সরকারি চাকরি পাবে দেশের প্রতিবন্ধীরা। বর্তমানে ৯০ হাজার প্রতিবন্ধী প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত ৫০০-১২০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক উপবৃত্তি পাচ্ছে। ■

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

এ মাসের শব্দ ধাঁধা

শব্দ ধাঁধা

পাশাপাশি: ১. বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী, ৩. অনিচ্ছাকৃত দায়ভার, ৫. লম্বা গলা বিশিষ্ট প্রাণী, ৬. আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো জেলা, ৮. সরকারি ঘোষণা

উপর-নিচ: ১. চপল/ অস্থির, ২. সুবিন্যাস/ সুশৃঙ্খল, ৩. ফুলের নাম, ৪. মধ্য আমেরিকার একটি দেশ, ৭. দেশের নকশা

■	■	১				■	■
■	■		■	■	■	■	২
■	৩			৪	■	■	
■		■	■		■	■	
৫			■	৬		৭	
■		■	■		■		■
■	■	■	■	■	■		■
■	■	■	৮				■

এ মাসের ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৭	*		-	৬	=	
-	■	*	■	+	■	-
	+	৩	-		=	৫
/	■	-	■	-	■	/
৩	*		-	৭	=	
=	■	=	■	=	■	=
	*	২	-		=	৭

ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সংখ্যার ব্রেইন ইকুয়েশনের সমাধান পাঠিয়েছেন

মো. আলিম রহমান শুভ, একাদশ শ্রেণি,
সরকারি শেখ মুজিবুর রহমান কলেজ,
টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ

গত সংখ্যার শব্দ ধাঁধার সমাধান:

■	■	বি	■	■	■	আ	■
সা	কি	ব	আ	ল	হা	সা	ন
ৎ	■	র	■	■	■	ন	■
ঘা	■	ণ	■	ফু	■	■	ব
তি	■	■	■	ফু	স	ফু	স
ক	র	তো	য়া	■	জা	■	নি
■	■	র	■	চু	রু	লি	য়া
ম	র	ণ	শী	ল	■	■	■

গত সংখ্যার ব্রেইন ইকুয়েশনের সমাধান:

৬	*	২	-	৯	=	৩
+	■	+	■	-	■	+
২	*	৪	-	৩	=	৫
-	■	-	■	-	■	-
৫	+	৪	-	৩	=	৬
=	■	=	■	=	■	=
৩	+	২	-	৩	=	২

মো. রাফিউল ইসলাম, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, শের-ই-বাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় আগারগাঁও, ঢাকা

মো. সিনদিদ হোসেন, এসএসসি পরিক্ষার্থী, ফয়জুর রহমান আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-43, No- 9, March 2019, Tk-20.00

লিলিয়ান ত্রিপুরা, ষষ্ঠ শ্রেণি, সানি বিচ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, কক্সবাজার

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা